হইয়াও, কি কারণে যে নির্য্যাতিত বা তিরস্কৃত হইল, তাহা জানিবার অধিকার প্রায় কোথাও তাহাকে দেওয়া হয় না।

শৈশব হইতে এই দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে যাহারা লালিত পালিত হয়, তাহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা যে অঙ্কুরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহাদের নিকট হইতে দেশ অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারে?

এই দূষিত হাওয়ার মধ্যে বাস করার দরুণ তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি দিনদিনই বিকৃতি-প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং, একদিকে যেমন মানসিক-দাসত্ব রূপ ক্রমিক বিষ-প্রয়োগের দ্বারা আমরা তাহাদের মধ্যে অনেকের প্রকৃত মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটাইতেছি, তেমনি অপরদিকে কাহারও কাহারও বা সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনতার সৃষ্টি করিয়া সমাজকে দিনদিনই ক্ষীণবল করিয়া তুলিতেছি। আবার এই বিষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আর একদিকে এক মহা অনিষ্টেরও সূত্রপাত হইয়াছে। এই বিষাক্ত বাষ্প মনোমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, কাহারও কাহারও এমনই অবস্থান্তর ঘটাইয়াছে যে, ভালমন্দ যে কোন বিষয়ই তাহারা এখন আর বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না, কুকুর-দষ্ট ব্যক্তির জলাতঙ্কের মত এখন তাহারা যে কোনও অনুষ্ঠানেই প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

এইরূপে আমাদের কার্য্যের এই ত্রিবিধ ফলে সমাজের শক্তি দিন দিনই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

আমাদের মতে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ও শিক্ষকদের এমন একটি মিলনের স্থান বা সমিতি থাকা উচিত, যেখানে সমবেত হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের প্রতিনিধিগণ শিক্ষক মহাশয়দের নিকটে অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, সরল ও অকপটচিত্তে বিনীতভাবে তাহাদের অভাব অভিযোগ নিবেদন করিতে পারিবে। সেখানে শিক্ষকগণকে শিক্ষকের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া অভিভাবক বা হিতৈষী বয়োজ্যেষ্ঠ সুহৃদের আসনে বসিতে হইবে। সেখানে, শিক্ষকগণ সর্ব্বদাই ছাত্রদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকারের পূর্ণ সীমা কোথায়, সে অধিকার-লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা কি, ইত্যাদি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবেন এবং তাহাদের অভাব অভিযোগের সম্পূর্ণ ন্যায্য মীমাংসা করিবেন। স্বাধীনতার বীজ শৈশব হইতেই তাহাদের কোমল হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তবেই ভবিষ্যতে আমরা তাহাদের নিকট কিছু আশা করিতে পারিব। নচেৎ কোনরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। দশ বার বৎসর যাহারা অম্লান বদনে সকল প্রকার নির্য্যাতন, অত্যাচার ও অবিচারই সহ্য করিয়া আসে, তাহারা বয়োপ্রাপ্ত হইয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবে বা ন্যায্য অধিকার দাবী করিবে, এরূপ আশা করা, আকাশ-কুসুম হইতেও দুরাশা।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

সঙ্গণিকা।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। প্রেস এবং সংবাদ পত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল আইন প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা, বর্ত্তমান অবস্থায়, কতদূর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা বিচার করিবার জন্য নিখিল-ভারত-ব্যবস্থাপক-সভা হইতে একটা কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সে সংবাদ পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলাম। সম্প্রতি তাঁহাদের সুবিবেচিত সংস্কার-ব্যবস্থা নিদ্ধারণ করিয়া সেই কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। মোটামুটি, এই কমিটির পরামর্শ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রেস এণ্ড রেজিষ্ট্রেসন এক্ট কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইলেই, সকল প্রকার বে-আইনীর সম্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে, ১৯০৮ এবং ১৯১০, খৃষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান প্রেস এক্ট' ও নিউজপেপার সাইটমেণ্ট টু অফেন্সেস এক্ট সম্বন্ধে রদ

করিবার কোন বাধাই থাকিতে পাবে না। আমাদের বিশ্বাস, কমিটির এই প্রস্তাব সরকার বাহাদুরের সাগ্রহে বরণ করিয়া লওয়া উচিত। এই সকল 'দমন' আইনের দ্বারা লাভ যতদূর না হইয়াছে, দেশের মধ্যে শাসন প্রণালীর উপরে যে প্রগাঢ় অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, উত্তরোত্তব তাহা মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, শাসব ও শাসিতের মধ্যে আজ এক ক্ষোভ-মূলক অনাস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত হইলে, সেই আইনের বলে, সরকারের আমলাবর্গ যদি কোন পত্র বা গ্রন্থকে রাজদ্রোহিতা দোষে দুষ্ট বিবেচনায় সাধারণে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন ও তাহা বাজেয়াপ্ত করেন, তাহা হইলে সেই নির্দ্ধারণ বা ব্যবস্থা বা আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ যে কোন ব্যক্তি সেই সকলের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক মহামান্য প্রধান বিচারালয়ে নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারের দাবী করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাবে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ বা প্রবন্ধ যে প্রকৃতই রাজদ্রোহিতা দোষে দুষ্ট আদালতের সম্মুখে তাহা প্রমাণের ভার, (onus of proving) সরকারের উপরই ন্যস্ত করা উচিত, কমিটি এই প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়া আমাদের আরো কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এই রিপোর্টের উপর আমলাতন্ত্রের বিষ নজর পড়িয়া থাকিলে, আমরা আশ্চর্য্য হইব না। তবে ভরসা, ব্যবহারিক-কুল-তিলক বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরের বিচক্ষণতা ও ন্যায় বিচারের উপর। এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটা কথা বলিবার আছে। এই সকল দমনকারী বিধির বলে বহু মুদ্রাযন্ত্র, বহু সংবাদ পত্র বহু গ্রন্থের প্রচলন রহিত হইয়াছে। যাহা গিয়াছে, তাহার আর প্রতিকরে না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু, আমাদের বিবেচনায় এই সকল আইনের দ্বারা সাহিত্য জগতের যে সকল অমূল্য রত্ন রাজকে বিলুপ্তির রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে, সে গুলি পুনরুদ্ধারের আয়োজন অনতিবিলম্বেই করা উচিত। এই প্রয়াসে সরকার বাহাদুরেরও সহায়তা লাভ বাসনা করিলে, নিতান্তই কি দুরাশা হইবে?

* * * *

চা-বাগানের কুলিগণকে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে নিদারুণ এক মর্ম্মপীড়ক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। একদিকে, তাহাদের মনে কি গভীর বেদনা ছিল, যাহার প্ররোচনায় তাহারা ধ্রুবকে ত্যাগ করিয়া, রোগশোক, জ্বালাযন্ত্রণা, দুঃখ কষ্ট, অত্যাচার অবিচার, অনাহার নিগ্রহকে বরণ করিয়া লইয়া, নিরাশ্রয় অবস্থায় অজানা ভবিষ্যতের দিকে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা স্মরণে হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের এই ব্যবহার, সহযোগিতা-বর্জ্জন-নীতির নেতৃবর্গের উত্তেজনার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, মন প্রবোধ মানে নাই। পক্ষান্তরেই আমাদের, নিজের দেশের লোক যখন আমাদের শাসন-ব্যবস্থার উচ্চ আমলা হইয়া বসেন, তখন যে তাঁহারা আমলা-সাধারণের-প্রচলিত অবিমৃষ্যকারিতা মুক্ত হন না, চাঁদপুরে কুলীদিগের উপরে নৃশংস অত্যাচারে, তাঁহার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিয়া, হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি। বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভায়, তাঁহাদের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টায় বহু 'সওয়াল জবাব' হইয়াছিল। কিছুতেই কিছু হয় নাই, হইবারও নয়। আমলা-তন্ত্রের উপরে দেশের দশের অনাস্থা, শত সহস্রগুণে আজ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা সহজে বিমোচিত হইবার নয়।

খড়িয়াল খুনের বিচার-ফল, এই অনাস্থাকে আরো বদ্ধমূল করিয়াছে। সুযোগ্য বিচক্ষণ বিচারক মাননীয় বাকল্যাণ্ড সাহেবের নিরপেক্ষতার সহিত মামলার ঘটনাবলী জুরিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও, পাঁচ মিনিট কালের মধ্যে মনস্থির করিয়া, জুরিগণ, অধিকাংশের মতে, আসামীকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া ন্যায়-বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। জুরিগণের মধ্যে যাহারা একমত হইয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা, যতজন ইংরাজ বণিক ছিলেন, তাহার সমতুল্য। জুরিদের মধ্যে ছিলেন, একজন মাত্র বাঙ্গালী, আসামীকে নির্দ্দোষী বলিতে পারেন নাই, একজন মাত্র জুরি। এই প্রকার ঘটনা আজকাল যে একেবারে অসাধারণ তাহাও বলা চলে না। ইহাতেই বা কি মনোমালিন্য হ্রাস হইতে পারে? বৈষম্য ঘুচিতে পারে? আস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?

*　　*　　*　　*

রাজসাহীর জেল হইতে বহু কয়েদী পলায়ন করিলে স্থানীয় আমলা-বর্গের মধ্যে এক মহা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। সেই সময়ে, কয়েদীদিগকে পুনরায় ধরিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার কালে, স্থানীয় নির্দ্দোষী অধিবাসীগণের উপরেও অল্প বিস্তর অত্যাচার হইয়া পড়ে, গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত বৃত্তান্তে প্রকাশ। এই সকল ব্যাপারের প্রকৃত ঘটনা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, স্থানীয় কংগ্রেস সভা, একটা বে-সরকারী-কমিটি গঠিত করিয়া, তাহার উপর তদন্তের ভার অর্পণ করেন। এই কমিটি স্থানীয় তদন্তের ফলে, তাঁহাদের মন্তব্য যথা সময়ে প্রকাশিত করেন এবং কলিকাতার কতিপয় দৈনিক সংবাদ-পত্রে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন, প্রাদেশিক-কংগ্রেস কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী। রিপোর্টটি তিনি সদস্যরূপে স্বাক্ষর করেন এবং সম্পাদকরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন।

রাজসাহী জেলার জজ, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান-সিভিল-সার্ভিস-ভুক্ত, গ্রেহাম সাহেব। তিনিও কয়েদীদিগকে ধরিবার প্রয়াসে যে আয়োজন হয়, তাহার অন্যতম উদ্যোগী ও সহযোগী ছিলেন।

কংগ্রেস কমিটির রিপোর্টে নাকি কোন মন্তব্য আছে, যাহার দ্বারা এই গ্রেহাম সাহেবের মানহানি হইয়াছে। এই সর্ত্তে, কলিকাতা পুলিশকোর্টে, তিনি শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মুদ্রাকরের নামে নালিশ করিয়াছেন। মোকদ্দমার দিন সন্নিকট, তাই, এবিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা সমীচীন হইবে না। তাহা আইন-বিরুদ্ধ।

কেবল একটা কথা না বলিলেই নয়; ইহাতেই বা বৈষম্য কতদূর নিরাকৃত হইবে? কাকস্য পরিবেদনা

*　　*　　*

বাঙ্গালায় পুলিশ বিভাগ সংস্কার। বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভার বিগত অধিবেশনে, অধিকাংশের মতে, বঙ্গের পুলিশ-বিভাগ-সংস্কার বিচার কল্পে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায়, এই সকল কমিটির উপরে, আমাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। তবে, আমরা একথা বলিতে বাধ্য যে, পুলিশ-সংস্কার না হইলে, পুলিশের ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, দেশের লোকের পুলিশের উপরে প্রকৃত মিত্রভাবের মমতা না বসিলে, অধুনাতন

খাদ্য-খাদক, উৎপীড়িত-উৎপীড়ক সম্বন্ধ না ঘুচিলে, রাষ্ট্র-শাসন যন্ত্র নির্ব্বিবাদে চলিতে পারিবে না। কোথায় কোন দেশ আছে, জানি না, যেখানে, প্রজার মনে, পুবকোট্পালের উপর, ভারতের মত চিরন্তন বিরাগ দেখা যায়। দোষ, দেশের লোকের মোটেই নয়; বিনা কারণেও নয়। এই বিরাগই ক্রমে সমগ্র শাসন-প্রণালীর উপর একান্ত অশ্রদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া, প্রচলিত রাষ্ট্রীয় শক্তির মান, ইজ্জৎ, মর্য্যাদা, গৌরবকে একেবারে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। রাজায় প্রজায় আর সে পবিত্র পূজ্য-পূজারী ভাব, পিতা-পুত্র ভাব, রক্ষিত হইতেছে না। সেই জন্যই, আমরা সর্ব্বদা পুলিশ-বিভাগের কঠোর সমালোচনা করিয়া আমলা-তন্ত্রের বিরাগ ভাজন হইয়া থাকি। আমলা-তন্ত্রের স্মরণ রাখা উচিত, রাষ্ট্র এবং শাসন-প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এ বাসনা তাঁহারা ব্যতিত, অপরেও করিবার অধিকার রাখিতে পারে, দেশ ত তাঁহাদের নয়-ই, দেশের রাজাও কেবল তাঁহাদেরই নিজস্ব নয়, রাজা এবং রাজ-শক্তিকে গুরু গৌরবে গৌরবান্বিত দেখিবার বাসনা যে কেবল তাঁহাদেরই একচেটিয়া, তাহা নয়, দেশে, রাজার এমন অনেক ভক্ত প্রজা আছে, যাহারা খোসামুদি বিবর্জ্জিত হইয়া, অনাবিল ভাবে, রাজার ও রাজ্যের শ্রী-বৃদ্ধি কামনা করেন। আমলা-তন্ত্রের এ চেতনা কবে হইবে?

* * *

ষ্টিমারের ধর্ম্মঘট বিষয়ে, একদিকে গভর্ণমেণ্ট ও রেল ষ্টিমার কোম্পানী, অপর দিকে, কর্ম্মচারী-বৃন্দ ও অসহযোগনীতির পৃষ্ঠপোষক নেতৃবৃন্দ, এই দুইয়ের পরস্পরের মধ্যে কোন দলের শক্তি অধিক বলশালী ও দৃঢ়,—বর্ত্তমানে যেন তাহার বিচারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মাঝে পড়িয়া মারা যাইতেছে, নিরীহ প্রজাসাধারণ, যাহাদের কর্ম্মের জন্য, সামাজিকতার জন্য, ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য, অন্নচিন্তার জন্য, এদেশে ওদেশে গতায়াত করিতে হয়। ইহাদের যে দারুণ কষ্ট হইয়াছে, যে প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইতেছে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, ও কাহারো ভ্রূক্ষেপও নাই। সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র মাত্রেই, গতায়াতের সুব্যবস্থা রাজ্য সুশাসনের অন্যতম নিদর্শন। আজ পূর্ব্ববঙ্গে আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়েতে এবং অন্যত্র সে ব্যবস্থা মোটেই নাই। গভর্ণমেণ্ট কি অছিলায় তাহা প্রতিবিধানের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়া, অবলীলাক্রমে নির্লিপ্তভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কিছুই নাই, তাহা আমরা মানিয়া লইতে অক্ষম। অথবা, যদি কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা বা আইনতঃ অধিকার নাই, সে কথায়ও সত্যের অপচয় হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। জনসাধারণের সুখ সচ্ছন্দতা রক্ষা করিবার জন্য, শুধু যে গভর্ণমেণ্টের এবিষয়ে তৎপর হওয়া যুক্তিসিদ্ধ, তাহা নহে, গতায়াতের সুব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহচর্য্য ও চেষ্টা, প্রজামাত্রেই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দাবী রাখে। শাসন-সংস্কার ফলে, যখন গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগ প্রজা-তন্ত্রের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইবে, শাসন-মন্ত্রীগণ এইরূপভাবে, কোন-মতেই, এইরূপ অবস্থায়, তাঁহাদের দায়িত্ব-শূন্যতার ওজর করিতে পারিবেন না। তবে, এ বিষয়টী এখনও আমলা-তন্ত্রের সম্পূর্ণ অধিকার-ভুক্ত। আমলা-তন্ত্রের রাজত্বে ন্যায়ান্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচারের মাপকাটিও অন্য!

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনুরাগ।

[বিশেষ উৎসব উপলক্ষে লিখিত]

"ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের অনুরাগ বাড়ে কিসে" এইটীই আজকার আলোচ্য বিষয়। আজ সকলে একত্রিত হইয়া, এক প্রাণে ইহার আলোচনা করিতেছেন। কত অনুরাগী ভক্ত, বিশ্বাসী ভাই বোন হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া এই তত্ত্বটীর প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আপনাদের আগ্রহ, উৎসাহ, কার্য্য ও ধর্ম্মজীবন সুফল প্রদান করিবে, এই আশা অনেকের মনে জাগিয়াছে। আমি দূরে থাকিয়াও অসুস্থ শরীরে সেই আশায় আশান্বিত হইতেছি, সেই উৎসাহ আমার জীর্ণ শরীরকেও কথঞ্চিৎ বল প্রদান করিতেছে। প্রাণে ইচ্ছা হইতেছে যে ছুটিয়া যাই ও অনুরাগের প্রবাহে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া স্নাত ও পবিত্র হইয়া আসি। কিন্তু, দেহ দেহীকে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিতেছে না। এ কারণ সশরীরে যাওয়া অসম্ভব। দেহটা এখানে, মনটা আপনাদের নিকটে।

আহা! মনে হইতেছে যে, আজ যদি ভক্ত তুকারামের ব্যাকুলতা ও আগ্রহ পাইতাম, তবে আমার জীবনও সফল হইয়া যাইত। ভক্ত তুকারাম প্রতি বৎসর ভক্ত মণ্ডলীর সহিত পণ্ঢরপুরে যাইতেন। এক বৎসর পীড়িত হওয়াতে, তিনি বার্ষিক উৎসবে যাইতে পারেন নাই; কেবল ছট ফট করিতেছিলেন; যাত্রীদিগের সহিত কয়েকটী অভঙ্গ লিখিয়া নিজের মনোবেদনা জানাইয়া পাঠাইয়া দিলেন ও তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। আমার প্রাণে কি সেই ব্যাকুলতা আসিয়াছে! কিন্তু তবু পূর্ণ আশা করিতেছি যে এই নূতন উৎসবে নূতন ভাব আসিবে, পুরাতন জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে, অসাড় ভাব, অচেতন অবস্থা, অর্দ্ধমৃত ভাব, অবিশ্বাস, অপ্রেম, অমিল, অশ্রদ্ধা, অপবিত্রতা দূরীভূত হইবে ও পবিত্রতা, সরলতা, শ্রদ্ধা, প্রেম আসিয়া সকল হৃদয়কে প্লাবিত করিবে।

ব্রহ্ম কৃপা ধন্য! যে কৃপা আজ আমাদিগকে নিজ নিজ অবস্থায় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিতে দিল না; আমাদিগের অবস্থা শোচনীয় হইতেছে, বুঝাইয়া দিতেছে; এই অবস্থা দূর করিবার জন্য আগ্রহ দিয়াছে ও সকলকে একত্র করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে যে—আর নয়, নিজের শক্তি সামর্থ্যে কিছু হইবে না, ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর কর, আপনাকে ছাড়িয়া গা ভাসাইয়া দেও; ভয় নাই, ভয় নাই, ডুবিবে না, তিনি হাত ধরিয়াছেন, ঐ শোন তাঁহার অভয় বাণী; ব্রহ্মকৃপা আশাবাণী শোনাইতেছেন, সেই আশার আহ্বান পাইয়া আমরা কাঙ্গালের মত আকুল প্রাণে তাঁহার দ্বারে আসিয়াছি।

* এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে নব প্রাণনার উৎসব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ও ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। ভগবানের প্রতি অনুরাগ, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ও সকল মানবের সহিত অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে। ঐ শোন, হৃদয়নাথ আহ্বান

করিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিতেছেন—"তোমাকে চাই, তোমার কাজ কর্ম্ম কিছু চাহি না। ছুটিয়া চল!" তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাকে স্পর্শ করিয়া অনুরাগে বিভোর হও।

এই মত্ততাই ত অনুরাগ। অনুরাগ যে কি, তাহা বাক্যে বুঝান যায় না। হৃদয়ের ভাব কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? ভাষা ত অন্তরায়। অনেক সময় ভাষা দুর্বোধ্য; আবার কত সময়, ভাষা ভাবকে চাপিয়া রাখে বা বিপরীত অর্থ করিয়া দেয়। শিশু কি মার প্রতি ভালবাসা কথায় প্রকাশ করে? মা কি তাঁহার ভালবাসা বাক্যে বলিতে চেষ্টা করেন? ক্ষুদ্র মুখখানির হাসিতে যে শক্তি, মার স্পর্শে যে শক্তি, তাহা কি সহস্র বাক্য বিন্যাসে প্রকাশ পায়। কোনও দম্পতি কি প্রাণের অনুরাগ কথায় নিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হন? দেশ হিতৈষণা কি কথায়, না, প্রাণের ব্যথায়? মানব-প্রীতি প্রবন্ধে, না জীবনে?

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ কি কোন তেজস্বিনী ভাষায় নিবদ্ধ হইতে পারে? কখনই না। ভগবান দেখিতেছেন যে, তাঁহার প্রদত্ত অনুরাগ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে কি না? ব্রাহ্মমণ্ডলী সেই অন্তর্নিহিত অগ্নির উত্তাপ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলেই অনুভব করিবেন। নিজেকে ভুলিয়া অপরের হইয়া যাওয়াই ত অনুরাগ—এই অনুরাগ প্রাণে স্বভাবতঃই জন্মায়, কোন ক্রিয়ার দ্বারা উহা উৎপন্ন করা যায় না। অনুরাগের বস্তু নিকটস্থ হইলেই আপনি অনুরাগ জন্মায় ও প্রসারের অনুকূল অবস্থা পাইলেই বৃদ্ধি পায়। অতএব অনুরাগ বৃদ্ধির উপায়, আলোচনা দ্বারা কি প্রকারে বুঝাইব। যদি ভাল বাসিতে পারি, তবে উহার উৎপত্তি, স্থিতি ও বর্দ্ধনশীলতার পরিচয় জীবনে দিতে পারা যায়। অনুরাগ সংক্রমণ করে, ছড়াইয়া পড়ে, অগ্নির মত উত্তাপ ও আলোক সহজেই ব্যাপ্ত হয়।

(১) অগ্নির ধর্ম্ম উত্তাপ, অগ্নির নিকটে গেলেই, শৈত্য দূর হয়, জড়তা পরিহার হয়, নির্জীবতা অন্তর্হিত হয়, মৃত ভাব পলায়ন করে, সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হইয়া যায়। অনুরাগেও তাহাই হয়।

(২) অগ্নির দ্বিতীয় ধর্ম্ম, আলোক প্রদান। অনুরাগও প্রাণকে উজ্জ্বল করে। দূরকে নিকটে আনিয়া দেয়; অজ্ঞেয়কে, অদৃশ্যকে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করে; নিত্য অনিত্যকে, সার ও অসারকে স্পষ্ট করিয়া দেয়, আত্মীয় পর বোধ থাকে না, সমস্ত অবিশ্বাস চলিয়া যায়; সন্দেহ সংশয় দূর হয়।

(৩) অগ্নির সদৃশ অনুরাগ পরিবর্ত্তন ঘটায়, যাহার প্রাণে অনুরাগ আসে, সে নিজে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ও অপরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে।

(৪) অনুরাগ আপনাকে হারাইতে সমর্থ করে। অনুরাগের বশে, মা নিজেকে ভুলিয়া সন্তানের হইয়া যান, স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রী স্বামীর হইয়া যান।

(৫) অনুরাগ কদাচ নিষ্ক্রীয় থাকিতে দেয় না; সকল সেবার মূলে অনুরাগ।

(৬) যেখানে অনুরাগ সেখানে সহিষ্ণুতা। অনুরাগের খাতিরে সকলি সহ্য করিতে পারা যায়। যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্য অপমান, নিন্দা, নির্য্যাতন, ক্লেশ দুঃখ সকলি সহিতে পারা যায়।

(৭) অনুরাগ মুক্ত, স্বাধীন, কোন্ বাধা মানে না ও বদ্ধভাবে থাকে না।

সঙ্গীত সাতটী সুরে প্রকাশিত হয়, কিন্তু স্বয়ং অপ্রকাশিত, সেইরূপ অনুরাগ উপরোক্ত সাতটি লক্ষণে পরিচিত, কিন্তু উহা সাতটী লক্ষণের উপরে অনির্ব্বচনীয় এক বস্তু। অনুরাগ হইলে, উহা বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে প্রাণে অনুরাগ নাই, তথায় উহাকে উৎপন্ন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, উহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা বৃথা। যদি অনুরাগ বর্ত্তমান থাকে, তবে উহার কার্য্য সহজেই হইবে। নিম্নলিখিত উপায় কয়টী অবলম্বন করিলে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে—

প্রথম—অনুরাগের বস্তুকে প্রাণের নিকটে রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়—অনুরাগের বস্তুর গুণ দেখা ও গুণ কীর্ত্তন করিতে হইবে।

তৃতীয়—অনুরাগের বস্তুর মঙ্গল কামনা সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে।

চতুর্থ—অনুরাগের বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে।

পঞ্চম—অনুরাগের বস্তুর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে হইবে।

অনুরাগ বৃদ্ধির সাধারণতঃ এই উপায়। কিন্তু অনেক কারণে, অনুরাগ হ্রাস হয়। সাবধানতার সহিত সেই কারণগুলিকে পরিহার করিতে হইবে। সেই উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রথম—সমালোচনা, ছিদ্রান্বেষণ, দোষ ধরিবার ইচ্ছাকে দমন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়—দোষ দেখিলে উহা সমর্থন না করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয়—দোষ কীর্ত্তন করিবে না ও দোষ কীর্ত্তনে যোগ দেওয়া উচিত নহে।

চতুর্থ—সংশোধনের কার্য্যে প্রেমের সহায়তা লইতে হইবে। ঋষি টলষ্টয় ইহাকে spiritual chloroform নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পঞ্চম—যাঁহাদের সাহায্যে সংশোধন করা হইতেছে তাঁহাদের সকলেরই প্রেমানুগত হওয়া উচিত।

অনুরাগের বিষয় যথাসম্ভব বলিলাম, এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। ব্রাহ্মসমাজ বলিলেই ব্রাহ্মদিগের মণ্ডলী বা ব্রাহ্মদিগের সমাজ বুঝি। ব্রাহ্ম কে? যাঁহারা ব্রহ্মের সন্তান, ব্রহ্মের অনুরাগী, ব্রহ্মের সেবক, ব্রহ্ম পূজায় তৎপর। যাহারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন ও তাঁহাকে নিজের পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার উপাসনা দেশে প্রচলিত করিতে উদ্যোগী, তাঁহারা ব্রাহ্ম। যাঁহারা বিবেকে ব্রহ্মবাণী শুনেন ও সেই বাণীর অনুসারে জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম। যাঁহারা সংসারে, পরিবারে, সমাজে, জীবনে ব্রহ্মকে প্রথম স্থান দিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম। যদি "ব্রাহ্ম" ও "ব্রাহ্ম সমাজ" এই অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনুরাগ কি তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ "ব্রাহ্ম" হইতে পারে না। ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ, প্রধান প্রয়োজন। অনুরাগের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু "ব্রহ্ম" ব্রাহ্মের পক্ষে প্রধান। কি প্রকারে, কোন্ নিয়মে, কোন্ সাধন দ্বারা মণ্ডলীর মধ্যে অনুরাগ বৃদ্ধি হয় তাহা বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে ব্রহ্মই এই মণ্ডলীর প্রাণ। অতএব—

১। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মপূজা, ব্রহ্মানন্দরস পান, এই মণ্ডলীর প্রথম কার্য্য। ব্রহ্মভক্তি, ব্রহ্মানুরাগ যে যে উপায়ে বর্দ্ধিত হয়, তাহা করিতে হইবে।

২। যাহারা ব্রহ্ম অনুরাগী ব্রহ্মভক্ত তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হওয়া ও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রাখা ও প্রকাশ করা দ্বিতীয় কার্য্য।

৩। সকল ব্রাহ্মকে এক পরিবারের লোক মনে করিতে হইবে ও যাহাতে এই ভাব চির স্থায়ী হয়, তাহা করিতে হইবে।

৪। ব্রাহ্মসমাজ যে সকল জনহিতকর কার্য্যে হস্ত দিবেন, তাহাকে নিজের কাজ মনে করিয়া করিতে হইবে। যদি মতভেদ হয়, তবে প্রেমের সহিত বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে ও সাহসুতার সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। মণ্ডলী পরিত্যাগের ভাব মনে স্থান পাইবে না।

৫। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি না হইলে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিতেছে, ইহা অনুভব করিতে হইবে।

৬। সমবিশ্বাসীর সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহার সমূহ চেষ্টা করিতে হইবে ও তজ্জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

৭। নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাহাতে ব্রহ্ম-অনুরাগ প্রসারিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, নিজের চরিত্রে ব্যবহারে, ব্রহ্ম-অনুরাগ প্রদর্শিত করিতে হইবে। এমন কোন কার্য্য করা উচিত নয় যাহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের উপর দোষারোপিত হয় বা কলঙ্ক আসে।

৮। সন্তানাদি পরিবারবর্গ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন অনুভব করিলে, মহা শোকগ্রস্ত হইতে হইবে ও তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে হইবে।

৯। ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের কৃপার নিদর্শন। আমাদিগের নিজের, পরিবারের, দেশের, ও জাতির উদ্ধার ও কল্যাণের জন্য ইহা আসিয়াছে। এই ধর্ম্ম ও সমাজ ভিন্ন কল্যাণের আর কোন উপায় নাই, এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিতে হইবে।

১০। আত্মার কল্যাণ প্রথম, পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি উহাকে অতিক্রম করিয়া নহে, কিন্তু এ সকল, আত্মার উন্নতির অন্তর্নিহিত। আধ্যাত্মিক উন্নতি, ইহাদের বিপরীত পথে নহে।

১১। মিলনই এ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহলোকে সকলের সহিত মিলিত হইতে হইবে ও পরলোকে এই মিলনের ভাব সহায়তা করিবে ও মিলিত করিবে।

১২। সেবা, মিলনের প্রধান উপায়। সেবার মধ্যে স্বার্থ ও অহং ভাব থাকিবে না। জগতের সেবায় শরীর, মন, প্রাণ, অর্থ ও সমস্ত শক্তি অযাচিত হইয়া ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সকল সাধুকার্য্য নিজের কার্য্য বলিয়া করিতে হইবে; ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার ভাব থাকিবে না।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ এক সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; তাহাই

বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেই ব্রাহ্ম নামের অধিকারী হওয়া যায়, কিম্বা ব্রাহ্ম পিতামাতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলে ব্রাহ্ম হওয়া যায়, এই ভুল মত অনেকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরা ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা ততটা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। সুতরাং ব্রহ্ম-পূজা ও ব্রহ্মধ্যানের দিকে দৃষ্টি থাকে না। পারিবারিক সুবিধাই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে, ত্যাগের ভাব হ্রাস হইতেছে ও স্বার্থের ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে সমাজে এক বিপ্লব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা হয়। ধর্ম্মভাব যাহাতে শিথিল না হয়, তাহার চেষ্টার প্রয়োজন। এই বিশেষ উৎসব তাহারই চেষ্টা। ভগবানের চরণে ভিক্ষা, তিনি আমাদের জ্ঞানকে উজ্জ্বল করুন, প্রেমকে জাগাইয়া তুলুন ও আমাদের সমস্ত ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন করুন।

হে স্নেহময়ী জননী! এতগুলি সন্তানকে ডাকিয়া আনিয়াছ, তোমার প্রেমের প্রসাদ দিবে বলিয়া। দেও মা। তোমায় অনুরাগ দেও। হৃদয় ভরিয়া দেও, সকলে ভাগ করিয়া লই। তোমার অনুরাগ জগতকে বিলাইব। কেহ বঞ্চিত থাকিবেন না, কেহ একা একা ভোগ করিব না। চিরদিনের তরে মাতিব, মাতাইব। সুখে আনন্দ করিব। তোমার গুণ গাইব। আমরা আর কি বলিব। নিস্তব্ধ হইয়া তোমার চরণে মাথা রাখিতেছি। তুমি স্পর্শ কর ও আশীর্ব্বাদ কর। ওঁ॥

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

এপার ওপার।

এ পারেতে সাঁঝের পাখী আপন নীড়ে যাচ্চে ফিরে।
ও পারেতে ভোরের পাখী গাইছে সুখে প্রভাতীরে,
এ পারেতে তরী খুলে যাচ্ছে ভেসে কোন অকূলে,
ও পারেতে নেচে গেয়ে হাজার যাত্রী ভিড়্চে তীরে।
এ পারেতে রাত্রি আসে, ও পারেতে ঊষা হাসে,
এ পারেতে নাম্‌চে আঁধার, ও পারেতে জল্‌ছে হীরে।
এ পারেতে নিচ্চে বিদায়, ও পারেতে বুকে জড়ায়
এ পারেতে কেবল রোদন, ও পারেতে মিলন ঘিরে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা জগতে যৎকিঞ্চিৎ।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব]

গতবারে আমি অভিভাবকদের কথা বলেছি, এবার নিজেদের কথা একটু বলব। আমরা যারা শিক্ষকতা করি, তাঁরা যে সবাই ভাল আর নির্গুঁৎ নন, তা মাষ্টার মশাই হরেন্দ্র বাবুর কাছ থেকেই গতবারে শুনেছি। পাঠশালার নিদ্রাতুর গুরুমশাই, আর ইস্কুলের গম্ভীর মুখ হেডমাষ্টার মশাই এবং সঙ্গে গল্পখোর আমরা, সকলেই বিশেষরূপে পরিচিত আছি। এঁরা এক একটা ছাপমারা জাতি বা type।

গল্পের পাঠশালার গুরুমশায়ের মত, তাম্রকূট-সেবা-পরায়ণ, নিদ্রালু গুরুমশাই যে বাস্তব জীবনে স্কুলে ও দেখা যায় না, তা নয়। আমি জানি একজনকে, যার মাঝে মাঝে ক্লাশ পালিয়ে বাইরে গিয়ে হুকা দেবীর মান-ভঞ্জন না করে না আসলে চলতই না। ছাত্রেরা জানত, গুরুমশাই পেট-বোগা, কিন্তু একদিন "সাধুর একদিন" এল, আর গুরুমশাই ধরা পড়ে গেলেন। সেদিন তাঁর মত বেচারা আর কেউ ছিল না। একজন শিক্ষয়িত্রীকে জানি, যার তামাক খাওয়া অভ্যাস ছিল না বটে, কিন্তু পড়াতে পড়াতে ঘুমের ঘোরে ঢোলা অভ্যাস ছিল। এঁর আওয়াজ ছিল ভারী কোমল আর মিঠে, কাজেই ইনি যখন নিদ্রা কাতর হয়ে পড়তেন, তখন এঁর গলার সুরে এমন এক মোহিনী শক্তি দেখা দিত, যার ফলে এঁর ছাত্রীরা যদিও কোমল শৈশবে তাঁরা থাকতেন না, এঁর পদাঙ্কানুসরণ করে ঘুমের রাজ্যে উপস্থিত হতেন। মাষ্টারমশাই ক্লাশে ঘুমাচ্ছেন, নাকও একটু একটু ডাকছে, ছাত্রীরা পরম আরামে, নিশ্চিন্ত ভাবে টুকটাক খেলছে, কি সেলাই করছে এমন সময় বিদ্যালয়ের কার্য্য-পরিদর্শিকা যিনি, তিনি এসে উপস্থিত হলেন। ছাত্রীরা ব্যস্ত হয়ে, কন্যাকুমারীকা খুঁজতে মাপের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। একজন একটু দুষ্টু, চেঁচিয়ে বল্লে, "ও পণ্ডিতজী, কুমারীকা কোথায় পাচ্ছি না যে, আপনি ত ঘুমোতে লেগেছেন।" পণ্ডিত চমকিয়ে উঠেই এক হুঙ্কার দিয়ে উঠিলেন "কুমারীকা কোথায় জান না, মূর্খ? হিমালয় জান, হিমালয় থেকে কুমারীকা পর্য্যন্ত—সিধা আঙ্গুল নামিয়ে যাও"। পরিদর্শিকা এতে খুব সন্তুষ্ট হয়ে, পণ্ডিতজীর বিষয়ে যে খুব প্রশংসাজনক রিপোর্ট লিখলেন না এ, বলা বাহুল্য।

অনেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছেন, যারা মনে করেন ছাত্র ছাত্রীদেরই সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর প্রতি ব্যবহার বলে একটা জিনিস আছে, তাঁদের সম্বন্ধে ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি ব্যবহার বলে যেন কোনও একটা কথা নাই। তাঁরা যেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সুতরাং, তাঁরা যা বলেন বা করেন তা নির্ভুল এবং ছাত্র ছাত্রীকে তা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করতে হবে। আমি জানি একজনকে, যিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঠিক মত করতেন না, সাহিত্যের অধ্যাপনা তিনি করতেন, কিন্তু বাড়ীতে নিজে ভাল করে আপনার অধ্যাপনার বিষয় দেখে আসতেন না। ফলে, তিনি অনেক ভুল করতেন—ব্যাখ্যায় এবং শব্দার্থে। ছাত্রীদের মধ্যে একজনের কোনও কারণে কোনও শব্দার্থ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, সে অন্য কোনও অধ্যাপিকার কাছে সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ উপস্থিত হয়। ইনি যে অর্থ করেন বালিকাটীর তা মনের মত হয় এবং তারপর সে এঁকে অনেক গুলি কথার অর্থ এবং শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। তারপর দিন, অধ্যাপনার কাজ যখন প্রথম

জন আরম্ভ করেন, তখন এই বালিকাটী বলে "আপনার কৃত অর্থ আমার ঠিক মনে না হওয়ায়, আমি অমুককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি অভিধান দেখে এই বলে দিলেন, আপনার কি মনে হয় না এইটা ঠিক ?" অধ্যাপিকা মহা বিরক্ত হয়ে উঠে বল্লেন "কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমি বলে দিলাম মানে, তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আবার অমুকের কাছে যাওয়া, আর অভিধান দেখা। আমি যা বলব তাই কোথায় নির্ব্বিচারে মেনে নেবে, না এই সব ফাজলামি। মেয়েটার নামে প্রধান আচার্য্যার কাছে নালিশ নিয়ে তিনি এলেন। দ্বিতীয় অধ্যাপিকাটীরও নামে অকারণ হিংসার অভিযোগ করতেও বাদ দিলেন না, অথচ তিনি জানতেনই না যে এই অধ্যাপিকার পাঠ তিনি বুঝিয়ে দিলেন।

এঁরা নিজেদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে এত ব্যস্ত যে যেটা এঁরা জানেন না বা ভুলে গিয়েছেন, সেটা স্বীকার করতে এঁরা লজ্জা বোধ করেন, পাছে "আমি জানি না" বা "আমি আজ এখন বোঝাতে পারলাম না, আমায় একটু দেখে নিতে হবে" বলে ছাত্র বা ছাত্রী তাঁকে সব-জান্তা নয় বলে চিনে ফেলে অশ্রদ্ধা করে ফেলে। জীবন্ত বিশ্বকোষ হওয়াই যেন জীবনের চরম সার্থকতা। ছাত্র ছাত্রীরা তাঁদের অন্যান্য কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করলে, এঁরা ভয়ানক চটে উঠেন। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন একদিন আমাদের এক শিক্ষক বল্লেন "তোমরা পড়ার বই এর বাইরে যদি কিছু জানতে চাও, আমায় জিজ্ঞাসা করো, আমি বলে দোবো।" ইনি মাঝে মাঝে এমনি করে আমাদের general information এ শিক্ষাদান করতেন। সকলে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল, ইনি প্রসন্নমুখে উত্তর দিতে লাগলেন, মাঝে মাঝে "কি বোকা। এটাও জান না। এতো খুবই সহজ" এরকম বলে আমাদের শিশুমনের ক্ষুদ্রত্ব এবং অল্পজ্ঞানকে আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে তুলতে লাগলেন। আমি খুব উৎসাহ সহকারেই এঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "আচ্ছা, আকাশ কেন নীল ?" আমার আট বৎসর বয়সের মস্তিষ্কটী এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য কিছু দিন আগে থেকেই ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ মাষ্টার মশাই এর হাসিমুখ একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল এবং তিনি গর্জ্জন করে উঠলেন—"ফাজিল"। তাঁর বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, কথাটার উচ্চারণ এবং চীৎকার ঠিক সেই রকমই হয়েছিল। শিশু আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে রৈলাম এবং নিজের অপরাধ কিছু না বুঝেও দণ্ড-গ্রহণ করলাম। কিন্তু ক্লাশের অপেক্ষাকৃত বড় অন্য শিশুরা হাসাহাসি করল যে, মাষ্টার মশাইকে এবার কিন্তু কঠিন প্রশ্নই করা হয়েছে, যাহোক।

এই ধরণের লোকেদের মধ্যেই বেশীর ভাগ ছাত্র ছাত্রীদের ভুল নিয়ে কঠোর তামাসা করার প্রবৃত্তি বেশী দেখা যায়। শিক্ষার্থী যে, সে যদি নিভুলই হবে, সব প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক উত্তর দেবে, সে শিক্ষার্থী হয়ে আসবে কেন ? সে তো শিক্ষকের সঙ্গে শাস্ত্রের লড়াই সুরু করে দিবে—এটা এঁদের মনে আসে না। কতবার তারা ভুলে যাবে, কতবার তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, অসহিষ্ণু বা ধৈর্য্য-হারা হলে যে চলবে না, এটা আমরা খুব অল্প সময়েই মনে রেখে কাজ করি।

আমার একজন সহকারিণী একদিন আমায় এসে বল্লেন "—শ্রেণীর মেয়েগুলি ভয়ানক বোকা! কাল আমি ওদের এত করে পড়া বুঝিয়ে দিলাম, ওরা বুঝল না। আজ বলছে, কিছু

বোঝে নি—আমি ওদের এই বই পড়াতে পারব না। অত ধৈর্য্য আমার নেই।" অপর একজন আমায় বল্লেন "তোমার ধৈর্য্য আছে কি ? তুমি পড়াবার ভারটা নেও না।" বইটা, বিশেষতঃ সে অংশটা তাদের পক্ষে বাস্তবিক কঠিন ছিল—আমি চেষ্টা করলাম এবং যদিও তারা বল্ল "বুঝেছি" আমার মন সন্দেহ-মুক্ত হ'ল না। কিছুদিন পরে আমি প্রশ্ন করে দেখলাম আমার সন্দেহ ঠিক, আমি তখন অপর একজনের শরণাপন্ন হলাম। আমি ছাত্রীদের মাতৃ-ভাষায় অংশটা তাদের বুঝিয়ে দিতে অক্ষম, অথচ ইনি তা পারেন, কাজেই এঁকে বল্লাম "আপনি একটু দেখবেন, এরা বোঝে না বলে আমার মনে হচ্ছে।" ইনি বোঝালে পরে, আমি এদের মুখ দেখেই বুঝলাম যে, এরা বুঝেছে। আমি খুসী হয়েই বল্লাম—"এখন বুঝেছ ত ? এতদিন তো কিছুতেই বুঝ্‌ছিলে না।" আমার সহকারিণীটি বল্লেন "তুমি খুসী হয়ে যাচ্ছ ? তোমার বোঝানোকে যে ওরা খেলো করল, তা দেখলে না ? আমার ত রাগ হচ্ছে।"

এঁদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন যাঁরা স্থরুতে খুব মিষ্টি করেই বলেন "দেখো, না বোঝো যদি, আমায় বলবে, আমি যতক্ষণ তোমরা না বোঝো বুঝিয়ে দোবো।" এবং প্রথমবার যখন বোঝান, তখন অতি স্নেহের সহিত "বুঝ্‌লে ত—এ্যা" ইত্যাদি বলেই বোঝান্। আমার বাল্যকালে, এই রকম একজনের সঙ্গে আমার পরিচয়ের ফলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়ে গিয়েছিল, তা দূর হতে দশ বৎসর সময় লেগেছিল। অঙ্কের শিক্ষয়িত্রী বলেছিলেন "যতবার জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, আমি বুঝিয়ে দেবো। না বুঝ্‌লে ভয় পেয়ো না, জিজ্ঞাসা কোরো।" একদিন দুর্ভাগ্যক্রমে আমি শূন্য শ্লেটখানি ধরে বল্লাম "আমি বুঝি নি।" শিক্ষয়িত্রী বল্লেন "এদিকে এসো"। তাঁর গলার স্বরে তখন মিষ্টত্ব নেই বল্লেই হয়। আমি ত দুরু দুরু বুকে উঠে গেলাম। তিনি বল্লেন—"হাঁটু গেড়ে এইখানে বোসো।" তারপর বোর্ড মোছা ঝাড়নটা দিয়ে, আমার কাণ না ধরে, চীৎকার করতে করতে বল্লেন—"কেন বোঝো নি—হুঁ" আর কাণখানা ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে অঙ্ক বোঝাতে লাগ্‌লেন ; সে গানের তালের ঠেকা হ'ল, "আর বোল্‌বে বুঝি নি—আর বোল্‌বে ?" আমার অপমান-কাতর মন তখন বল্‌ছে "হে ধরণী দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি"। আমি ত সেদিন অঙ্ক বুঝলামই না। পরন্তু যতদিন স্কুলে ছিলাম, অঙ্কশাস্ত্রটাকেই ভালবাস্‌তে পারি নি। কতজন এরকম আছেন যাঁরা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে শিশু চিত্তের বিশ্বাস এবং নির্ভরকে এইরকম নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করেন—অথচ এঁরা হচ্ছেন শিশু-চিত্ত-গঠন-কারী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী !

ক্লাশে যে পড়া পারে না, সে যে কেন ওরকম, তা খোঁজ করা যে শিক্ষকেরই কর্ত্তব্য, এটা অনেক শিক্ষক মনেই আনেন না। একটুখানি প্রশংসা যে অনেক সময় কাজের উৎসাহ আনে, উপহাস যে শিশু-চিত্তকে এমন নির্ম্মমভাবে আঘাত করতে পারে, যে তার সকল কর্ম্ম-চেষ্টাকে নিষ্প্রভ করে দেয়, এসব কথা অনেকে খেয়ালেই আনেন না। আমি জানি একজনকে,—যাঁর কাছে বিদেশী ভাষায় কথা বলতে গিয়ে, প্রথম শিক্ষার্থী drink এর যায়গায় eat বলেছিল, তাই নিয়ে তিনি এতবার তাকে উপহাস করেছিলেন যে, মর্ম্মান্তিক আহত হয়ে, সে বেচারা সে ভাষাতে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছিল।

আরেক দল আছেন যাঁরা শুচিবায়ু-গ্রস্ত। এঁরা সকল কিছুতেই পাপের অঙ্কুর দেখ্তে পান এবং তাকে সমূলে উৎপাটিত কর্বার জন্য বিধিমত চেষ্টা কর্তে ক্রটী করেন না। এঁরা এটা জানেন না যে, যেখানে শিশু-চিত্তে পাপের কোনও ধারণাই আসে নাই, কোনও অশুচি-চিন্তা আসেই নাই, সেইখানে এঁদের এই ব্যবহার দ্বারাই কৌতূহল জাগিয়ে তুলে, অশুচিতা বা অশ্লীলতার দিকে দৃষ্টি আনেন। একবার কলকাতার কোনও মিশনারী স্কুলে একটী পাচ ছয় বৎসরের ছোট ছেলে সমপাঠিকা একটা ঐ বয়সী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিল "ভাই, কাল আমার কাকার বিয়ে হয়ে গেল, কত মজা হয়েছিল, আমার কেমন কাকীমা এল, চকচকে সাদা সিল্কের কাপড় পরে (ছেলেটী খ্রীষ্টান), তোকে আমি অমনি কাপড় দোবো তুই আমাকে বিয়ে কর্ব্বি?" মেয়েটী উত্তর দিল "যাঃ, লাল কাপড় দিস্ ত বিয়ে কর্ব্ব, নৈলে নয়"। ছেলেটী লাল কাপড় দিতেই রাজী হ'ল, কিন্তু শিক্ষয়িত্রী অত্যন্ত রেগে গিয়ে দুটী শিশুকেই কঠিন দণ্ড দিলেন এই বলে "ফের, এইসব অশ্লীল কথা! বিয়ে করা আবার কি?" দণ্ড এত কঠিন হয়েছিল যে ক্ষীণ দেহা মেয়েটী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং সারারাত বিকারের ঘোরে চেঁচিয়েছিল "আমি কখ্খনো বিয়ে কর্ব্ব না—বিয়ে অতি খারাপ কাজ।—এর কাকা বড্ড খারাপ কাজ করেছে।" এইখানে কিছুদিন আগে একটা বিধবা এসে তাঁর শিশু-কন্যাকে দিয়ে গেলেন এই বলে যে তিনি অসহায়া, কন্যাকে শাসনে রাখ্তে পারেন না, সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটীর কাপড় চোপড়, দেহ যে রকম ময়লা, কথাবার্ত্তাও তেম্নি রুচি-হীন। অনেক সময়েই সে অন্য কোনও শব্দ অজানা থাকার দরুণ এমন শব্দ প্রয়োগ করে যা সভ্য সমাজে আমরা ব্যবহার করি না। একে সংশোধনের ভার নিলেন প্রায় সকল শিক্ষয়িত্রী ই। কথায় কথায় একে চোখ রাঙান, কঠিন শাসন, উপদেশ এবং উপহাস চলতে লাগ্ল। "ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এমন কথা মুখে আন! কাণে আঙুল দিতে হয়" এতো চলতেই লাগ্ল, সময় সময়ে অনেককে ডেকে সে কি বলেছে তা বলে ধিক্কারের হাসি এবং তামাসা চলতে লাগ্ল। মেয়েটী অবাক্, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকৃত, কখনো কখনো সকলকে হাস্তে দেখে হাস্ত। সে সর্ব্বদাই শুন্ত "তোর কাপড় যেমন ময়লা, শরীর তেমন ময়লা, মনও তেমনি ময়লা।" আমি একদিন অতি সঙ্কুচিত ভাবেই প্রস্তাব কর্লুম "আমার কাছে একে কয়েক দিন দেবেন কি? দেখি, আমি কিছু করতে পারি কি না।" আমায় সকলেই একবাক্যে আশ্বাস দিলেন "কিছু করার ও বাইরে। তবে আমি ওকে দেখ্তে পারি।" লজ্জাবতী খুসী হয়েই বল্লেন "আমি ত এঁদের শিশু পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই এঁরা হাসেন, এখন দেখা যাক্ তোমায় দেখে যদি এঁরা বোঝেন।" আমি ত প্রথমেই তার দেহ খানা পরিষ্কার করার দিকে মন দিলাম। সে দুএক দিনেই নিজেকে পরিষ্কার রাখ্তে শিখ্ল এবং সে বিষয়ে বেশ যত্নবতীই থাকতে লাগ্ল। আমার হাতের মধ্যে তার হাতখানা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে দিয়ে, আমায় সে একদিন জিজ্ঞাসা করল "তুমি আমার 'সহেলী' না?" আমি বল্লাম "হাঁ"। তখন সে বল্ল "দেখো, আমি এখানে এসে অবধি ভাব্ছি এ কোন্ যায়গায় এলাম, সব্বাই আমার উপর বিরক্ত; আমায় শ'তান শ'তান বলে। আমার ভাল লাগ্ছিল না। তুমি আমায় ভাল বাস্বে?" আমি বল্লাম "আমি তোমায় ভালবাসি"। সে দৌড়িয়ে গিয়ে সকলকে এ

র-খবর শোনাতে গেল এবং সবলে যখন উপহাসের হাসি হেসে উঠ্‌ল তখন সে যা কথা উচ্চারণ কর্‌ল তা' শ্রুতিমধুর নয় এবং যে ব্যবহার কর্‌ল তা' সুখদায়ক নয়। সবাই মিলে তাকে ঠেলে ঠেলে আমার কাছে নিয়ে এলেন ; "যা তোর সহেলীর কাছে যা, বল্ গিয়ে যে সব কথা এখানে বলেছিস্—দেখিবি তখন কত আদর ভালবাসা পাস্।" অপরাধী সে যখন নতশিরে আমার কাছে এলো, তাকে বল্লাম "তুমি যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে, তোমার দেহ কি এত পরিষ্কার থাক্‌ত ? তোমার কাপড় এরকম সুন্দর থাক্‌ত ?" সে বল্ল "না"। আমি বল্লাম "এখানে যেমন দেহ কাপড় পরিষ্কার রাখ্‌তে হয়, মনও তেমনি রাখ্‌তে হয়, কথাও তেমনি রাখ্‌তে হয়। নোংরা যারা তারা ঐ রকম বলে। পরিষ্কার যে, সে বলে না।"

"আমি নোংরা কথা বলেছি তুমি আমায় 'দণ্ড' দিবে ?" "হাঁ, তুমি ঐ কোণটায় গিয়ে খানিকক্ষণ দাড়াও সঙ্গিনীদের সঙ্গে খানিকক্ষণ খেলা বন্ধ।" আমার সহকারিণীরা অনেকেই এত অল্পদণ্ডে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেন। একজন বল্লেন "তা, এমনি করে বুঝি ছেলে শাসন কর্‌তে হয় ? এতে কি কখনো ছেলে জব্দ হয় ? আমি হলে আজ ওকে জুতোপেটা কর্ত্তুম"। আমি শান্তভাবেই বরং একটু ক্লান্ত সুরেই বল্লাম "সেই ত। আমি যে আমি, আপনি নই"। মেয়েটা কোণে দাঁড়িয়ে রৈল, আমি ঘরে চুপ করে একটা চেয়ারে বসে রৈলাম। সে খানিক্ষণ পরে বল্ল "তুমি বাইরে যাবে না ?" আমি বল্লাম "আমি কি করে যাই তুমি রয়েছ যে"। "তুমি কতক্ষণ থাকবে ?" "যতক্ষণ না তোমার আপশোষ হবে, নোংরা কথা বলেছ বলে।" একটু পরেই ফোঁস্ ফোঁস্, তারপর জোরে জোরে কান্না। "তোমারও তা হলে 'দণ্ড' হ'ল যে। আমি আর এমনি কর্ব না"। অথচ একে কাঁদাবার এবং ক্ষমা চাওয়াবার জন্য আমার সঙ্গিনীরা কত রকম কঠিন পন্থা অবলম্বন করেও একে টলাতে পারেন নি।

আরেক জনকে আমি জানি, যাঁর কথায় কথায় চড় চাপড় দেওয়া অভ্যাস। ইনি পুত্রবতী। আমি এঁকে এরকম করা আমি পছন্দ করি না বলাতে, তাঁর মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে তিনি যে সন্তান-পালন সম্বন্ধে বেশী জানেন, তা প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। আমি বল্লাম "আপনার বক্তব্য, আপনি আপনার সন্তানদেরও মারেন, এই ত। তাদের যখন মারেন, তখন আপনার মনটা যে রকম ব্যথায় ভরে ওঠে এবং পরে তাদের যত রকম আদর করেন, এদেরকে মারতে গেলে আপনার সেরকম মনে হয়, না, পরে সেরকম আদর করেন ? সত্যি বলুন ত"। তিনি বল্লেন "না, তা হয় না বা করি না"। আমি বল্লাম "তবে নিজের ছেলের দোহাই দিয়ে পরের ছেলেকে মেরে শিক্ষা দিতে যাবেন না, অন্ততঃ আমার কাছে নয়।"

যাঁরা মারেন না বা বোঝান না কিন্তু শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে বসে আধ ঘণ্টা ধরে চোখ বুঁজে ভগবানকে ডাকতে থাকেন, অবাক হত ভম্ব শিশুটিকে সুমতি দেবার জন্য, ভগবান তাঁদের ব্যাপার দেখে কি ভাবেন, জানি না। আমার হাসিও পায় এবং মন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। যে নিরাকার ভগবানের সত্তা ভাল করে উপলব্ধি করতেই পারে না, তার চোখের সামনে রুদ্রের বজ্র-সমুদ্যত মূর্ত্তির একটা ভীষণ কল্পনা জাগিয়ে তুলে, মঙ্গল-স্বরূপকে জুজুতে পরিণত করাটা গভীর অন্যায় বলেই মনে হয়। জানি না, আজ কত বিপথ- যাত্রী এই সাক্ষ্য দিবে যে, শৈশবের এই

জুজুর উদ্যত বজ্রকে তার মিথ্যাচরণের উপর সম্পতিত না হতে দেখে, তার নামবার পথ সুগম হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু তাও হয় দেখেছি।

আজকার এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দিনে, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে সখ্যভাব এসে গিয়েছে, বিশেষতঃ যেখানে শিষ্য 'প্রাপ্তেন ষোড়শ বর্ষে' হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অনেকে সে কথা ভুলে যান এবং সেই জন্যই শিষ্য-চিত্তের উপর বিশেষ প্রভাব রাখ্‌তে পারেন না এবং যে সম্মান শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে নিজেকে দূরে দূরে রাখেন, তাতে শিষ্য-চিত্তে স্থানই নিতে পারেন না। আমি অনেক স্থলেই দেখেছি, বন্ধ গুরুর প্রতিই ছাত্র-চিত্ত বিশ্বস্ত, সশ্রদ্ধ ও স্বর-প্রেম কিন্তু শ্রদ্ধা-লোলুপ তোমা-হতে-অনেক-উচ্চে-স্বর্গে-আছি-প্রকৃতি বিশিষ্টদের প্রতি বিমুখ-চিত্ত এবং সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা-হীন।

এই সমস্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রীকে না জেনে অন্যায় রূপে শাস্তি দিয়ে পরে অন্যায় টের পেয়েও স্বীকার কর্‌তে লজ্জা পান। কিন্তু এটা যে কিসের লজ্জা, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুতেই আসে না। কলাম্বোতে থাকৃতে, আমি একবার বুঝ্‌তে ভুল করে, একটা ছাত্রীকে সকলের সামনেই তিরস্কার করেছিলাম। কারণ, যে কাজটা তার নামে আরোপিত হয়েছিল, অতিশয় গুরুতর দোষের কাজ হয়েছিল। পরে আমি টের পেলাম যে সে নির্দ্দোষী। একটা ভুলের বোঝা তার উপর পড়েছে। তখন আমি সকলকে একত্রিত করে সকলেরই সাম্‌নে আমার দুঃখ জানিয়ে ক্ষমা চাইলাম। আমার কাজ যে আমার সঙ্গিনীদের অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকেছিল, তা নীচের ঘটনাতেই জানা যাবে। আমার এক সহকর্ম্মিণী অপর কোনও কলেজে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন "ভারতবাসীরা বড় অদ্ভুত প্রকৃতির নয় কি?" তিনি বল্লেন "কেন?"

"আমাদের প্রিন্সিপাল ভারী মজার। তিনি আজ এক ছাত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।"

"কেন?"

"অন্যায় করে শাস্তি দিয়েছিলেন বলে! ভারতবাসীরা মজার নয় কি?"

উত্তরে প্রিন্সিপ্যালটা বলেছিলেন 'আমি এই ভারতবাসীরই বংশ জাত বলে গৌরব অনুভব কর্‌ছি।" আমার সহকর্ম্মিণী চুপ হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় একজন আমায়ই বলেছিলেন "আপনি কেন ক্ষমা চাইলেন?" আমি বল্লাম "ক্ষমা চাওয়া কি? অন্যায় করেছি তা স্বীকার কর্‌লাম, তাতে দোষ কি?"

"দোষ হয়নি ত। আপনি যে প্রিন্সিপ্যাল।"

"অতএব আমার অন্যায় হয় না। কিম্বা হলেও তা গ্রাহ্য কর্‌তে হবে না?" বন্ধুটী বল্লেন "আপনার সঙ্গে ত কথা ক'য়ে পার্ পাবার যো নাই। যা' খুসি করুন।

এইত গেল গুরু-শিষ্য সংবাদ। বারান্তরে গুরু-গুরু সংবাদ সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রৈল।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস !

পারি না বিষ্ণুপ্রিয়া !

মনে করি বটে সংসারে রই, প্রবোধ মানে না হিয়া।
একটি মোহের মধুর আবেশে রচিয়া একটি গেহ ,
মদিরা মত্ত মাতাল মতন ডুবাব চিত্ত দেহ।
একটি কুসুম একটু গন্ধ একটি শোভন মুখ,
একটি প্রাণের প্রীতির সুধায় তৃপ্ত থাকিবে বুক।

ভাবি এই কত বার।

রোধিতে কিন্তু পারিনা আমার মুক্ত বক্ষ-দ্বার।
ভিড় করে সেথা ঢুকিছে বিশ্ব উতরোল আহ্বান
মন্দ্রিত সেথা পাগল করার উন্মাদময় তান,
দেহ অনুরাগে ভেসে যায় সাধ ভাসে যে নিখিল ধরা,
আমি কোন ছার কেমনে বুঝাব বিটান সকল-হরা।

কেন গো ছাড়িব ঘর ?

অখিল ভবন আমার আপন কেহ নাই কোথা পর।
তোমারি মতন সবারে এখন মর্ম্মে ধরিতে সাধ,
তুমিই প্রথমে জানালে তো, দেবি, ভালবাসিবার স্বাদ।
শোণিত লোলুপ শ্বাপদের মত এখন চিত্ত মোর
প্রণয় লালসে লালায়িত সদা জ্বলিছে পিয়াসা ঘোর !

যাহাদের ভালবাসি—

তাহাদেরি লয়ে সংসার করা তারে বল সন্ন্যাসী ?
কোটী জীব যার আপন স্বজন ভুলে থাকা তার সাজে ?
আপনারি সুখে আপন পুলকে স্বার্থেরি ছোট কাজে।
তারা যে আমার পথের ধূলায় ব্যথিত ক্লান্ত ভীত,
তীব্র দুখের অনল জ্বালায় সদাই জর্জ্জরিত।

কেমনে রহিব ঘরে ?

আমার প্রেমিক পাগল পরাণ কাঁদে যে সবারি তরে !

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

সাধু অঘোরনাথ।

মহা প্রেমিক শ্রীচৈতন্যের প্রধান সঙ্গী পরম ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া, উক্ত গ্রামখানিকে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। এই অদ্বৈতাচার্য্যের বংশে, শান্তিপুরে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ এবং বৈদ্যবংশে তাঁহার বাল্য ও যৌবনকালের পরম বন্ধু সাধু অঘোরনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রামের সুনাম রক্ষা করিয়াছেন। শান্তিপুরের এই দুই ধার্ম্মিক পুরুষের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ ভক্ত, অঘোরনাথ যোগী, বিজয়কৃষ্ণ অসীম সুন্দরের অপরূপ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন, অঘোরনাথ সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া প্রেম-স্বরূপের সঙ্গে যোগে যুক্ত হইয়া থাকিতেন। বিজয়কৃষ্ণ দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, তাঁহার শিষ্য সেবকও ছিল বিস্তর, এই জন্য তাঁহার বৃহৎ জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে, দেশের অনেক পুরুষ ও নারী উহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু অঘোরনাথের অকালে মৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁহার শিষ্য সেবক না থাকায়, তাঁহার কোনরূপ উৎকৃষ্ট জীবনচরিত প্রকাশিত হয় নাই, অনেক দিন পূর্ব্বে ভক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয় অঘোরনাথের ছোট একখানি জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই গ্রন্থ ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ আছে। তাহার বাহিরেও যে উহার প্রচার আছে, কই, আমরা ত উহার কোনই প্রমাণ পাই নাই। অথচ এই সাধুপুরুষের সাধনের কাহিনী ও জীবনের চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরই জানা প্রয়োজন। অঘোরনাথের ন্যায় একজন সাধক ও ত্যাগীপুরুষ হিন্দুসমাজে, খৃষ্টানসমাজে, ব্রাহ্মসমাজে, অথবা যে কোন সমাজেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, ইঁহার দুই চারিটা মত ও কার্য্যের সঙ্গে লোকের মতের অনৈক্য থাকে ত থাকুক না কেন, আসলে এই শ্রেণীর সাধু ও ত্যাগী পুরুষের জীবনই সকলের একটা সম্পত্তি, এই সকল জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তিই ত হৃদয়ে হৃদয়ে মহৎভাব উদ্দীপিত করিয়া তোলে। আমি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই এই রচনাটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অঘোরনাথ ১২৪৮ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ শান্তিপুরে একটি সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও একজন সুবিজ্ঞ কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপত্তি ও এ রকম আশ্চর্য্য নাড়ী-জ্ঞান ছিল যে, তিনি নাকি রোগীর হাত ধরিয়া নাড়ী টিপিয়াই, কোন্ দিন তাহার মৃত্যু হইবে, বলিয়া দিতে পারিতেন। সেজন্য তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ত ছিলই, তাহা ছাড়া, তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যোগ-সাধন করিতেন বলিয়া, যোগীপুরুষ রূপেই লোকের অতিশয় শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অঘোরনাথ পিতার সাধুতাও ধর্ম্মভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য, শৈশবকাল হইতেই তাঁহার নির্ম্মল প্রকৃতির মধ্যে কোমল, মধুর এবং আধ্যাত্মিক ভাব লক্ষিত হইত। তিনি ছেলেবেলা হইতেই শান্ত, শিষ্ট, ক্ষমাশীল ও দয়াবান্। তিনি বাল্যকালে কাহারো জন্য কিছু করিতে না পারিলেই, অতিশয় দুঃখিত হইতেন;

কিছু করিতে পারিলে আর সুখের সীমা থাকিত না। এজন্য বালক অঘোরনাথের প্রতিবেশীরা প্রায়ই তাহার হাতে হাটবাজার করিবার পয়সা দিতেন; তিনি সমস্ত জিনিস কিনিয়া, লোকের বাড়ী বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিতেন। এজন্য তাঁহার ঘরের লোকেরা ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন—"তুই কি লোকের চাকর, যে তাহাদের জিনিস কিনিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে দিয়া আসিস্" ? অঘোরনাথ ঐ রকম তিরস্কার শুনিয়া শুধু হাসিতেন।

অঘোরনাথ পাঠশালায় বাঙ্গলা তাহার পরে টোলে সংস্কৃত শিখিয়া, আঠার বৎসর বয়সের সময়ে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া সংস্কৃত ও ইংরাজী পড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহার টোলের সহাধ্যায়ী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত। গোস্বামী মহাশয় ত তাঁহার বাল্যকালের বন্ধুই ছিলেন, তাহা ছাড়া, পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথের সঙ্গে এক শ্রেণীতেই পড়িতেন। এই পাঁচটি যুবা পুরুষের মধ্যে একটি অতি আশ্চর্য্য ভালবাসা জন্মিয়াছিল। পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ্যাবস্থার বিষয়ে বলিয়াছেন, "বিদ্যালয়ে আমার বন্ধু যখন পড়িতেন, তখন হইতেই তিনি বিনম্র, সরল ও প্রেমিক হৃদয় ছিলেন। বয়স্যগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহা তিনি মিটাইয়া দিতেন। কাহারও পীড়া হইলে সাধ্যানুসারে সেবা শুশ্রূষা করিতেন, সকলকেই ভালবাসিতেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩০- সালের 'নব্যভারতে' একটি রচনার মধ্যে লিখিয়াছেন—

"বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ ও আমি এই পাঁচ জনের মধ্যে এক সময়ে সুদৃঢ় প্রণয় বন্ধন ছিল। সংস্কৃত কলেজের ঘোর নাস্তিকতার সময়, আমরা পাঁচ বন্ধু "ভাগবত" বলিয়া উপহসিত হইতাম। সেই ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্য দিয়া আমাদের ভগবদ্ভাব দিন দিন উচিত হইতে লাগিল। বিজয় আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তিনি আমাদের দলের একরূপ নেতা ছিলেন। আমরা নির্য্যাতন ভয়ে বিজনে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতাম। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিমার্জ্জিত মনে করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে নিয়মিতরূপে যাইতাম।"

এই পাঁচ বন্ধুর মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ অনেকদিন পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের এক অভিনব আধ্যাত্মিক জ্যোতি স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দুই বৎসর হিমালয়ে ধর্ম্মসাধনের ফলে ঋষি-জীবন প্রাপ্ত হইয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া, তাঁহার সাধন-লব্ধ সত্য সকল উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছিলেন। তখন তাঁহার এক একটি বাক্য আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধর্ম্মার্থী যুবকদিগের হৃদয়ে গিয়া পড়িত এবং তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিত। এই সময়ে, একদিন, বিজয়কৃষ্ণও ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ শুনিয়া, উচ্ছ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে, মহর্ষিকেই ধর্ম্ম-গুরুরূপে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ অঘোরনাথও ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ইহার ফল হইল এই যে, ১২৬৭ কি ১২৬৮ সালে, বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ উভয়ে মিলিত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া ডাক্তারি পড়িতেছিলেন, অঘোরনাথও আর অধিক দিন সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পারিলেন না, ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের বাসনাই তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি কলেজ ত্যাগ করিয়া কিছুদিন গৃহে বাস করিয়াই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি পত্রিকায় স্বরচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে, পূর্ব্ববঙ্গের পরম হিতৈষী খ্যাতনামা ডেপুটি কালেক্টর রাজসুন্দর মিত্র, প্রসিদ্ধ স্কুল ইনস্পেক্টার রায় দীননাথ সেন বাহাদুর প্রভৃতির অনুরোধে, অঘোরনাথ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও ব্রাহ্ম স্কুলের মাষ্টার হইয়া উক্তস্থানে গমন করিলেন। এই সময় তিনি ২১ বৎসর বয়সের একটি যুবা পুরুষ, কিন্তু এই যুবা পুরুষের উপরই ঢাকার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের একটি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার উদয় হইল। তাঁহারা দেখিলেন, অঘোরনাথ ধর্ম্মকেই সত্যবস্তু ও সকলের চেয়ে বড় জিনিস বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাই ধর্ম্মের উপরে তাঁহার এমনই অটল বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার এমনই হৃদয়ের প্রেম যে, তিনি অম্লান বদনে সুখের ও স্বার্থের পথ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছেন।

অঘোরনাথ ঢাকায় মাত্র এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাহার পরেই তিনি কলিকাতায় আসিয়া বিবাহ করিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারেও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সৎসাহসেরই পরিচয় পাওয়া গেল। এখন ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কতই অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে, হিন্দু সমাজেও অসবর্ণ বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন কোন্ বৈদ্যের ছেলে সাহস করিয়া কায়স্থের মেয়ে বিবাহ করিবে? তাহা হইলে ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে। কিন্তু অঘোরনাথ সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশের ছেলে হইয়াও নির্ভীকচিত্তে একটি কায়স্থ বংশীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

অঘোরনাথ বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া তাহার পরে কি করিলেন? তিনি কি অর্থোপার্জ্জনের, স্বার্থ সাধনের ও সাংসারিক সুখের জন্যই আপনার সময় ও শক্তি অর্পণ করিলেন! না, তাহা নহে। বিবাহের পরেই ফকির হইয়া, দারিদ্র্য ও সকল রকম সাংসারিক কষ্টকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যোগ সাধন ও ঈশ্বরের সেবাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে সাধন ও ঈশ্বরের সেবার জন্য তিনি যে পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও নয়ন অশ্রু সিক্ত হইয়া যায়। যিনি যথার্থই ভক্ত, যিনি ঈশ্বরকেই প্রভুরূপে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহার সেবাব্রতে ব্রতী। তিনি যে ঈশ্বরের জন্য ছাড়িতে পারেন না এমন সুখ নাই, করিতে পারেন না এমন কাজ নাই, সেই কথাটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমরা এখন অঘোরনাথের যোগ-সাধনের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। পরে, ঈশ্বরের সেবার জন্য এই ধার্ম্মিক পুরুষের আত্মত্যাগের চিত্তাকর্ষক কাহিনীই বর্ণনা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অঘোরনাথের পিতা একজন সাধক ও যোগী পুরুষ ছিলেন।

পুত্র, পিতার প্রকৃতি হইতেই, যোগের একটি অনুকূল অবস্থা লাভ করিয়া ছিলেন, তাঁহার অন্তরের মধ্যেই যোগের একটি নিগূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। এখন সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। অঘোরনাথের পক্ষে সাধন এমন স্বাভাবিক ও ধ্যান এমন সুখের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল যে, তিনি কলিকাতায়ই থাকুন আর ধর্ম্ম প্রচারার্থে নানা স্থানে ভ্রমণই করুন, একটু নির্জ্জন জায়গা এবং কর্ম্মের মধ্যে একটুকু অবসর পাইলেই, আপনার প্রিয়তম দেবতার নিরুপম সত্তার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন। শুধু তাহাই নহে। সময় সময় তিনি যোগী ঋষিদিগের প্রিয় স্থান হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিতেন, সেখানে তাঁহার সমস্ত সময় যোগসাধনে ও শাস্ত্রঅধ্যয়নেই অতিবাহিত হইত।

১৮৭৫ সালে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন অনুভব করিলেন, বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া, সহরের কোলাহল হইতে একটু দূরে গিয়া, গম্ভীরভাবে ধর্ম্ম সাধন করা প্রয়োজন, নচেৎ ধর্ম্মের একটি নিরাপদ জায়গায় এবং সাধনের একটি উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই অঘোরনাথ ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারকদিগকে সঙ্গে লইয়া বেলঘরিয়ার নির্জ্জন উদ্যানে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা স্বহস্তে রন্ধন ও গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র ও অঘোরনাথ প্রভৃতির সাধনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, স্বয় বেলঘরিয়ার উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কেশব চন্দ্রকে বলিলেন—"বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।"

এই যে শুভমুহূর্ত্তে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত পরমহংস মহাশয়ের মিলন হইল, এই মিলনের পরেই তাঁহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেমের সম্বন্ধ মধুর ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

অতঃপর ১৮৭৬ সালের ১লা ফাল্গুন বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ এই দুই বন্ধু মিলিত হইয়া ভক্তি এবং যোগ সাধনের জন্য বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিলেন। এই ব্রত উদযাপনের নিমিত্ত ইহার নিয়ম ও বিধি সম্বন্ধে তৎকালে যে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচিত হইয়াছিল, তাহা এই—

প্রাতঃসংস্মরণং স্নানং নামশ্রবণমেব চ।
উপাসনা চ শোভাদেযোগসম্বন্ধিনস্তথা॥
পাঠশ্চ বিবিধগ্রন্থাৎ রন্ধনং দানমেব চ।
অন্নানং হৃদরিদ্রায়, সেবা চ পশুপক্ষিণাম্॥
তরুগুল্মাদিকানাঞ্চ ভোজনং পঠিতস্য চ।
শ্লোকাদোহিস্মৃদ্দিশ্য পরেষাং পঠনং পুনঃ॥
সৎপ্রসঙ্গস্তপস্যা চ ধ্যানং দেশে চ নির্জ্জনে।
সঙ্গীতঞ্চ স্তবাশ্চৈব ভক্তশীর্ব্বাদযাচনম্॥
যোগাভ্যাসো নিশীথেহত্র সংযমে যোগসিদ্ধয়ে॥

—'আচার্য্য কেশবচন্দ্র। মধ্যবিবরণ। ৮০৪ পৃঃ।

যোগ শিক্ষার্থী প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়াই সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবেন। তাহার পরে প্রাতঃস্নান করিয়া ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবেন।

'আচার্য্য কেশবচন্দ্র'। মধ্যবিবরণ। ৭৭১ পৃঃ।

উপাসনান্তে বিবিধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিবেন. রন্ধন হইলে, দরিদ্র ও পশু পক্ষীদিগকে অন্নদান এবং তরুলতার সেবা করিয়া আহার করিতে বসিবেন। তাহার পরে প্রাতঃকালে পঠিত যোগবিষয়ক উপদেশগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া সংপ্রসঙ্গ করিবেন। অবশেষে নিজ্জনে ধ্যান ও তপস্যা। রাত্রির প্রথম ভাগে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যোগাভ্যাস করিতে হইবে।

অঘোরনাথ যোগসাধনের এই ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রতি দিনই নিয়মানুসারে প্রত্যেকটি কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার এমনই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল যে, সাধনের অতি তুচ্ছ একটি নিয়মও ভাঙ্গিতে পারিতেন না, শরীর প্রতিকূল হইলে দাঁড়াইলেও না। এইরূপ সংকল্পের বল ও মনের দৃঢ়তা না থাকিলে সাধনে কি তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া একজন সাধু পুরুষের মধ্যে গণ্য হইতে পারিতেন?

অঘোরনাথ একবার মস্থরা পর্ব্বতে গমন করিয়া কিছু দিন যোগ সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সময়ের সাধন সম্বন্ধে ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মহাশয় লিখিয়াছেন—

এই সময় অঘোরনাথ পর্ব্বতে যে কয়েকদিন ছিলেন, কেবল নিজ্জনে ধ্যান ও যোগসাধনে অতিবাহিত করিতেন। প্রাতে আসিয়া সুন্দর অরণ্য মধ্যে নির্ঝর তীরে গিরি গুহাভ্যন্তরে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান আরম্ভ করিতেন ... [illegible] ... বিরলে একাকী ব্রহ্মসম্ভোগ তাঁহার একটি অতিশয় সুখের ব্যাপার ছিল। গিরি গুহায় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া গভীর যোগানন্দ এবং ভক্তির যে সকল বর্ণনা করিতেন, তাহা শ্রবণে সকলের চিত্ত বিমুগ্ধ হইত।

অঘোরনাথ যে শুধুই যোগ সাধন করিতেন, তাহা নহে, তাহার জীবনে সুমধুর ভক্তির ভাবটিও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে স্বয়ং কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর উপর হইতে একটি উপদেশের মধ্যে বলিয়াছেন—

ভাই অঘোর হিমালয়ের বুকের ভিতরে সেখানে মানুষের চক্ষু কর্ণ যায় না, সেখানে যোগধ্যানে সময় কাটাইতেন।

* * অঘোর কি কেবল পাহাড়েই থাকিত? যখন কীর্ত্তন হইত, অঘোর সর্ব্বাগ্রে যাইত। পাশে দাঁড়াইয়া সে কর্ত্তাল বাজাইত, তখন কি অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইত। অঘোর কাঁদিত, হরি হরি বলিয়া মুগ্ধ হইত। * * হরির প্রিয় তিনি সাধুভক্ত। যে "ধ্রুব প্রহ্লাদ" বই খানি তিনি লিখিয়াছেন, পৃথিবীতে নিজেই সেই ধ্রুব প্রহ্লাদ ছিলেন। ছেলে মানুষের মত তিনি, এই দুটি ছেলের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, সেই আদর্শে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।"

এখন অঘোর নাথের সেবার কাহিনী। সেবা শব্দটি উচ্চারণ করিলে পীড়িত লোকদের শুশ্রূষার কথাই আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া থাকে। কিন্তু অঘোরনাথ মনে করিতেন, রোগের জ্বালা, দারিদ্র্যের ক্লেশ ও শোকের যন্ত্রণার চেয়েও নরনারীর অধর্ম্মের ও পাপের যে দুর্ব্বিসহ যাতনা, তাহাই অত্যন্ত ভয়ানক; এবং ধনৈশ্বর্য্যের সুখের অপেক্ষা সুদুর্লভ ধর্ম্মলাভের যে আনন্দ, তাহাই অতিশয় গভীর। অতএব ঈশ্বরের সেবক হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া— যে সকল দুর্ব্বলচিত্ত নরনারী পাপের পথে চলিয়াছে, তাহাদিগকে পুণ্যের দিকে আকর্ষণ করা এবং যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তোলাই সুমহৎ সেবার কার্য্য। অঘোর নাথ এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার স্বার্থও সুখের

বাসনা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিলেন এবং ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সুদূর সিন্ধু প্রদেশ হইতে আসাম পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই ধর্ম্ম-প্রচারের বিবরণ উপন্যাসের ঘটনার ন্যায় অতীব চিত্তাকর্ষক। সেই জন্য উক্ত বিষয়ে আমি অল্প গুটিকয়েক ঘটনার উল্লেখ করিব।

বোধ হয় ১৮৬৬ সাল হইতেই কেশবচন্দ্রের এবং তাঁহার মণ্ডলীর লোকদিগের ধর্ম্মপ্রচারের স্পৃহা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে মানব সমাজের ও মানব জীবনের এক মহৎ আদর্শ মায়ামূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল এবং হৃদয়ে হৃদয়ে আশ্চর্য্য কুহক বিস্তার করিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশ দেশান্তরে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা মানবসমাজকে এবং স্বীয় স্বীয় জীবনকে তাঁহাদের মহৎ আদর্শের অনুরূপই গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন। এই জন্যই স্বয় কেশবচন্দ্র ধর্ম্মোৎসাহে পমত্ত হইয়া বাঙ্গালাদেশে, পঞ্জাবে, বেহারে ও যুক্ত প্রদেশে গমন করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী এবং অনেক ইংরাজের সম্মুখে বক্তৃতার অগ্নি বর্ষণ করিতে ছিলেন। কে না জানে তখন তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসী ও ইংরাজ কিরূপ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই কেশবচন্দ্রই ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও যোগী অঘোরনাথকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। দুই বন্ধু পূর্ব্ববঙ্গের বিস্তর শিক্ষিত যুবককে যে কি আশ্চর্য্যভাবে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই আলোচনার যোগ্য।

আমরা অনেকেই জানি, গীতার সমন্বয় ভাষ্য, বেদান্ত সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয় জ্ঞানে ও ধর্ম্মে এ দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি তরুণ বয়সে রঙ্গপুরের পুলিসের ক্ষুদ্র একটি কার্য্য করিতেন। তাহার পরে অঘোরনাথ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যখন রঙ্গপুর সহরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই ধার্ম্মিকপুরুষের জীবনের ও উপদেশের প্রভাবে, কোথায় বা রহিল গৌরগোবিন্দের পুলিসের চাকুরি, কোথায়ই বা গেল তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা? তিনি সংসারের স্বার্থ পায়ে ঠেলিয়া, ফকির হইয়া, অঘোরনাথের সঙ্গেই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবশেষে জ্ঞানালোচনায়, সাধনায় ও ধর্ম্মপ্রচারেই তাঁহার সমস্ত জীবন কাটিয়া গেল এবং দারিদ্র্যই তাঁহার মস্তকের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইল।

একবার অঘোরনাথ সুগায়ক ও সুলেখক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীহট্ট এবং আসাম অঞ্চলে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের চিত্তাকর্ষক প্রচার বিবরণ সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য নাথ তাঁহার স্বরচিত "সাধু অঘোরনাথ" গ্রন্থের একটি স্থানে লিখিয়াছেন—

"অঘোরনাথের ধর্ম্মজীবন ও বৈরাগ্যই যে আমাকে তাঁহার সঙ্গী করিয়া দেশে দেশে লইয়া গিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যাগ হস্তে লইয়া ধর্ম্মপ্রচারে যাওয়া তাঁহার পক্ষে বৈরাগ্য-বিরুদ্ধ মনে হইত, এজন্য তিনি পিঠবোঁচ্‌কা পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া পথে চলিতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রায় দশ ক্রোশ করিয়া পথ আমরা হাঁটিতাম। মধ্যাহ্ন রবিতাপে অঘোরনাথের মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ হইয়াছে, গাত্রে ঘর্ম্ম ছুটিতেছে, অথচ তিনি দুস্তর অলঙ্ঘ্য গিরি, পর্ব্বত, নদ, নদী, কানন অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে অবিশ্রান্ত চলিতেছেন। উত্তর

অন্ন নাই, চরণে ছিন্ন পাদুকা, পরিধেয় মলিন বসন হাঁটুর উপরে উঠিয়াছে, পৃষ্ঠদেশে বস্ত্রের পোঁটোরি ঝুলিতেছে, সেই অবস্থায়ই পথে চলিতেছেন।* * কিসের জন্য এত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা? এইজন্য যে, ভারতের সীমা হইতে সীমান্তরবাসী নরনারীদিগকে ব্রহ্মোপাসনার অমৃত বিলাইয়া তাহাদিগকে সুখী করিবেন, জগতে সত্যের জয় ঘোষণা করিবেন। * * একদিন মধ্যাহ্নকালে এক ক্ষুদ্র পান্থশালায় উপনীত হওয়া গেল। মুদির দোকানে চিঁড়া ভিজাইয়া আহারে বসিব, এমন সময় বিকটদশনা যমকিঙ্করীর ন্যায় এক গণিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং অভিমান ও ক্রোধভরে তাহার রক্ষকের সহিত বিবাদ করিতে লাগিল। যে স্থানে আমরা ভোজন করিতে বসিয়াছি, তাহার উপরিভাগে সেই হতভাগিনীর দুর্গন্ধময় মলিন কন্থারাশি এবং অপবিত্র শয্যাদি স্থাপিত ছিল। গণিকা ক্রোধভরে তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আমাদের মস্তকের ও খাদ্যের উপরে ধূলা, মাটি, জঞ্জাল পতিত হইয়া আহারের সমূহ ব্যাঘাত করিল। * * একদিন মধ্যাহ্নকালে পথে কোথাও আর মুদির দোকান মিলিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর শ্রান্ত হইল। নিকটে একটি মসজিদ দেখিয়া আমরা তথায় প্রবেশ করিলাম। তৎসন্নিহিত এক মুসলমান গৃহে আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ অন্নব্যঞ্জনের সংস্থান হইল। পলাণ্ডুযুক্ত কিছু জলীয় পদার্থ আর অন্ন আমরা পাইলাম। আমার তাহাতে রুচি হইল না, কিন্তু অঘোরনাথ তাহাই অমৃততুল্য জ্ঞান করিয়া আহার করিলেন। জাতির প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া গৃহস্বামিনী ভোজ্যপাত্র ধৌত করিবার জন্য আমাদিগকে বাধ্য করিলেন। অগত্যা তাহাও করিতে হইল। * * শ্রীহট্টে যেদিন পৌঁছান গেল, সেদিন রাত্রে একটি ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় পাইলাম, কিন্তু পরের দিন তিনি স্থান দিতে সাহস করিলেন না। শেষে এক স্বতন্ত্র স্থানে সকল বন্দোবস্ত হইল, একজন কুলি আমাদের রন্ধন করিত। কিন্তু ধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য নাগরিকেরা অনেকে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেন।"

অঘোরনাথ একবার ধর্ম্ম প্রচারের জন্য মতিহারি হইতে সারণ যাইবার সময়ে ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিই তাঁহাকে আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা করিয়াছিল। এই বিষয়ে অঘোরনাথ নিজেই তাঁহার এক বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমরা সেই পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"প্রিয়বন্ধু, আজ আপনাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করি। আমি পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। * * যেখানে এই ব্যাপার হয়, সেই স্থানটি ছাপরা হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে। তাহার নাম ইসবাপুর বিখ্যাত চোরের গাঁ—পরে শুনিলাম। আমি সাম্পনি গাড়ীতে আসিতেছিলাম। ঠিক সন্ধ্যার সময় গ্রামে উপস্থিত হইলাম। আর কোন পথিক রহিল না, কেবল আমিই সেখানে থাকিলাম। দোকানদারেরা দোকান তুলিয়া গেল। একখানি তাড়ি ও মদের দোকান আছে, তাহাতেই জনকয়েক লোক থাকিল। * * রাত্রি দুইটা হইবে, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিশীথ সময় প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, আমি সেই সময় উঠিয়া বসিলাম। মনটা ভাবের তরঙ্গের ভিতর ডুবিয়া গেল। বেশ সম্ভোগ করিতেছি। এমন সময় একটা ডাকাতে হাঁক উঠিল, সহসা আমার মন সে রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল, সমস্ত শরীর ডোল হইয়া উঠিল। বোধ হয় দশ বার জন লোক ডাকাতি রকমের হাক দিতে দিতে তাড়ির দোকানের নিকটে আসিল। সেই হাঁকে বাস্তবিক পেটের পীলে চমকে যায়। আমার মন সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া ভয়ে দুঃখে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। খানিক একান্ত নির্ভরের সহিত দয়াময়কে ডাকিতে লাগিলাম। কিছুপরে ডাকাতদের মধ্যে গোলমাল উঠিল। কেহ গালি দিতেছে, কেহ বা আস্ফালন করিতেছে ও বলিতেছে "শালা ছোটা হায়, হাম্ একলা এক লাঠিসে শির তোড় দেঙ্গে।" খানিক পরেই একজন বলিয়া উঠিল "বস্, আবি লোটো।" * * 'তু দয়াল দীন হোঁ, তু দানী হোঁ ভিখারী" আর "ঠাকুর ঐ সো নাম তোমরা" এই দুই হিন্দি ভজন গাইতে গাইতে কখন যে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, তাহাও আমি জানি না। শেষে আমার বাহিরে যে কোন্ অবস্থা হইয়াছে, তাহাও আর মনে ছিল না। প্রিয়সখার সহবাস ও দর্শন সুখের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম।"

অঘোরনাথ হিন্দি ভজন গাহিতে গাহিতে ঈশ্বরের মধ্যে আত্মহারা ও অচৈতন্য হইয়া

গেলেন, তখন অমন যে দুর্দ্দান্ত পাষাণ প্রকৃতি ডাকাতের দল, তাহারাও অবাক্ হইয়া গেল। এক জন ডাকাত বলিয়া উঠিল—"আরে উয়ো ভকত হ্যায়।" ডাকাতেরা ভগবানের এই ভক্তকে হত্যা ত করিলই না, সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে, ডাকাতেরা অঘোরনাথের একটি টাকা অথবা একটি সামগ্রী অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিল না, সকলেই গৃহে প্রস্থান করিল।

আমরা শুনিয়াছি অঘোরনাথের বক্তৃতা করিবার শক্তি খুব সামান্যই ছিল, তিনি যে এক জন প্রতিভাশালী লোক ছিলেন, তাহাও নহে। কিন্তু সাধনের দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াই তিনি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্ম প্রচারার্থ নানা স্থানে গমন করিয়া আশ্চর্য্য ভাবে নর নারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিতেন, তাঁহার উন্নত ধর্ম্মজীবন, তাঁহার অপূর্ব্ব সরলতা, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, তাঁহার আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ, তাঁহার সুপবিত্র প্রেম দর্শন করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। তিন বৎসর পূর্ব্বেই আমি একদিন পূজনীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে, অঘোরনাথের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

অঘোরনাথ ও আমার গুরু তাঁহার কাছে ধর্ম্মবিষয়ে এত উপকার পাইয়াছি যে আমি প্রতিদিনই আমার উপাসনার সময়ে তাঁহাকে স্মরণ করি।

অঘোরনাথের বাঙ্গলা সাহিত্যের উপরেও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তিনি সুলেখক ছিলেন, কিছুদিন "সুলভসমাচার" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদনের কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অঘোরনাথ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া শাক্যসিংহের একখানি জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। এক সময়ে ঐ গ্রন্থখানির যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাঁহার রচিত ধ্রুব প্রহ্লাদ বইখানিরও প্রশংসা করা যাইতে পারে।

অঘোরনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে পঞ্জাব অঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত প্রদেশের নানা জায়গায় উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ডেরাস্মাইল খাঁ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ঐ স্থানটি সিন্ধু নদীর পরপারে ও ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে। যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন ঐ প্রদেশে যাইতে হইলে সাহাপুর হইতে উটের পিঠে চড়িয়া ১২০ মাইল অতিক্রম করিতে হইত। এই সুদীর্ঘ পথটি, যে কি দুর্গম, তাহা স্মরণ করিলেও অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে। এই পথে কেবলই ধূ ধূ মরুভূমি; যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই পর্ব্বতাকৃতি স্তূপীকৃত বালুকারাশি, পিপাসায় বুকের ছাতি ফাটিয়া গেলেও কোথাও এক বিন্দু জল পাইবার যো নাই। রৌদ্রের এমনই উত্তাপ যে, দিনের বেলায় কাহারই পথে চলিবার যো নাই, রাত্রিকালেই চলিতে হয়। অঘোরনাথ এই পথেই উটের পিঠে চড়িয়া অতিশয় ক্লেশ সহ্য করিয়া ডেরাস্মাইল খাঁ গমন করিলেন। তাঁহার মনে বড়ই ভয় ছিল, ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে না জানি সেই অপরিচিত স্থানে কতই নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের নামের এমনই শক্তি যে, সেই অপরিচিত স্থানেই অঘোরনাথের ভক্তিরসাত্মক সুমধুর ধর্ম্ম কথা শুনিয়া বিস্তর পুরুষ ও নারী তাঁহার

প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একটি সংস্কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ হিন্দুও তাঁহার বিদুষী ভগিনী অঘোরনাথকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতেছিলেন। এমন কি, উক্ত প্রদেশের মুসলমান পাঠানেরাও অঘোরনাথের বক্তৃতা শুনিতে কুণ্ঠিত হন নাই

কিন্তু হায়, ইহাই এই সাধুপুরুষের ধর্ম্ম-প্রচারের শেষ কথা, দুরন্ত কাল আর তাঁহাকে কোন কার্য্য করিবার সুযোগ প্রদান করে নাই। মরুভূমির দুর্গম পথের দারুণ ক্লেশ তাঁহার শরীর আর সহিতে পারিল না। তিনি ডেরাস্মাইল খাঁ হইতে ১২৮৮ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ লক্ষ্ণৌসহরে উপস্থিত হইয়াই রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিলেন।

পূর্ব্বেই তাঁহার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছিল; পথের কষ্টে সেই রোগই অতিশয় ভয়ানক আকার লইল। ২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবারে অঘোরনাথ বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সেদিনও একটি ধর্ম্মার্থী লোকের নিকট ঋগ্বেদের সাতটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। ২৮ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার অঘোরনাথের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল, সেদিন তিনি আর কথা বলিতে চাহিলেন না। তাঁহার প্রাণের দেবতার সঙ্গেই যোগযুক্ত হইয়া সুগভীর আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে, রাত্রি দুইটার সময় তখন চিকিৎসক বলিয়া উঠিলেন—

আর কি, সকলই শেষ হইয়া গেল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

চার্ব্বাক্ দর্শন।

মানব-সভ্যতার বিশেষ উন্নতির সময় দর্শন শাস্ত্রের অভ্যুদয় হয়। সত্যান্বেষী মন ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আপনাকে নিবদ্ধ রাখিয়াই তুষ্ট হয় না। অনন্তের প্রত্যেক বিভবের বৈচিত্রের সহিত স্বাধীন ভাবে বিবরণ করিয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব উপলব্ধির আনন্দ উপভোগ করে। দর্শন শাস্ত্রই মানবের মনুষ্যত্ব নিকষের মানদণ্ড। ভারতবর্ষ এবিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যজাতি যখন বর্ব্বরতার উলঙ্গ প্রকটনে ব্যাপৃত তখনই ত ভারতবাসী চিন্তা ও জ্ঞানানুশীলনের সর্ব্বশেষ বিষয়, বিচারের উজ্জ্বল কিরণপাতে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিল। আজ ইউরোপ যাহা ভাবিতে পারিয়া আনন্দে ভূমণ্ডল কলরবে মুখরিত করিতেছেন এবং সত্যের সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া আপনাকে ধন্য এবং বরেণ্য মনে করিতেছেন, বহুসহস্রাব্দী পূর্ব্বেই ভারতের সে জ্ঞান গবেষণার শেষ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে, ভারতীয় দার্শনিক সত্য গুলি (ideas of philosophical truths) অতি মিশ্রাকারেই মানব মনে বিরাজ করিত। ক্রমশঃ, সেইগুলি ধারা নিবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। এ কারণে, ভারতের কোন্ শ্রেণীর দর্শনের প্রথম অভ্যুদয় হয়, তাহা সঠিক ভাবে অবগত হইবার উপায় নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, অন্ততঃ পক্ষে বৈদিক

যুগের শেষ ভাগে, ভারতের দার্শনিক চিন্তা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ঋক্ বেদের শেষ গাথায় (দশম ১৮) অথর্ব্ববেদে এবং যজুর্ব্বেদের কোন কোন অংশে এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তাহার পর উপনিষদেই জ্ঞান কাণ্ড উজ্জলরূপে স্বীয় নিরবচ্ছিন্নতা প্রকাশ করে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেও যে ভারতীয় দর্শনের নয়টি বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল তাহা প্রায় সকল দার্শনিকই একবাক্যে স্বীকার করেন। আমাদের আলোচ্য চার্ব্বাক দর্শনও এই সময় নিজ নামে পরিচিত ছিল।

চার্ব্বাক্ দর্শনের অন্য নাম, লোকায়ত। খুব সম্ভব, ভারতের কোন দর্শনই হঠাৎ একজন দার্শনিক কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। ভ্রাম্যমান ভাবরাশিকে যে যে ব্যক্তি সংগৃহীত করিয়া সূত্রাকারে সঙ্কলিত করিয়াছেন প্রায় সেই সকল ব্যক্তির নামেই দর্শন শাস্ত্রগুলি আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। চার্ব্বাক্ দর্শনের সূত্রগুলি মহর্ষি বৃহস্পতি কর্তৃক সঙ্কলিত হয়। এই বৃহস্পতি যে কে এবং বৃহস্পতি-রচিত মূলসূত্র গুলিই বা কি, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ঋগ্বেদ ভাষ্য প্রণেতা সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা হরী মাধবাচার্য্যই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃহস্পতি-সূত্রের কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাহার "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে লিপি বদ্ধ করেন। চার্ব্বাক দর্শনের সাধারণ জ্ঞান এই পুস্তক হইতেই আমরা সংগ্রহ করিয়া থাকি। অধুনা Asiatic Societyর প্রযত্নে বৃহস্পতি-সূত্রের আরও কিছু কিছু অংশ সংগৃহীত হইতেছে। কাজেই আশা হয়, চার্ব্বাক দর্শনের জ্ঞান, কালে আরও বিশদ হইবার সম্ভাবনা চার্ব্বাকের মতগুলি প্রায় সকল দর্শনই শক্তি বলে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, চার্ব্বাক দর্শনও অন্যান্য দর্শনের ন্যায় অতীব প্রাচীন। চার্ব্বাক মত প্রত্যেক মানবেরই দৈনন্দিন জীবনের সহিত অজ্ঞাতসারে বিজড়িত থাকিলেও, ইহা পণ্ডিত সমাজে চিরকালই অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। সেই কারণেই, বৃহস্পতি সূত্রের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। প্রতিপক্ষের হস্তে পতিত হইয়া চার্ব্বাক এতবৎ কাল শুধু বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার উপহারই প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। তাহাদের নিকটই চার্ব্বাক "লোকায়ত" সংজ্ঞা (the way of the most common people) প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপেই বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি ওলক্য 'কণাদ' নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতম 'অক্ষপাদ' প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেন যে দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত চার্ব্বাক দর্শনের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, তাহার ঠিক মীমাংসা কঠিন। তবে এ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিংবদন্তীটি এই—সুন্দ ও নিসুন্দ অসুরদ্বয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে পরাভূত করিবার জন্য দেবগণের মায়ায় তিলোত্তমার জন্ম হইল, এদিকে অসুরগণের বুদ্ধির বিকার ঘটাইবার জন্য, মহর্ষি বৃহস্পতি চার্ব্বাক্-সূত্র প্রণয়ণ করিলেন, অসুরগণ চার্ব্বাক প্রচারিত মিথ্যা ভোগের মোহে মুগ্ধ হইয়া, গৃহ বিবাদ করিয়া উৎসন্ন হইল এবং দেবগণের এইরূপ কৌশলে শত্রু নিপাত হইল। তাহা হইতেই প্রতিপাদিত হইল যে, চার্ব্বাক দর্শন অধ্যয়ন করিলে মানুষ বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া যায়, কেবল মাত্র মিথ্যা ভোগ সুখের অন্বেষণ করে। মনে হয়, জড়বাদের প্রতি ঘৃণা জন্মাইবার জন্যই চৈতন্য-বাদিগণ উল্লিখিত উপাখ্যানের কল্পনা করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে চার্ব্বাক দর্শনের বিশিষ্টতার বিষয়ে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান যুগে ইউরোপীয় agnostic এবং materialistic movementএর সহিত চার্ব্বাক দর্শনের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। প্রাচীন গ্রীসের জড়বাদী Leucippus, Democratis, Empedocles, রোমান কবি Lucratius এবং তাহাদের মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ চার্ব্বাকের ন্যায় যুক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে, জড়বাদী Lamathrea, Holback-Vogt, Moleoschatt, Buckner, Fuerback এবং Strauss চার্ব্বাকের ন্যায় জড়-পদার্থ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। চার্ব্বাক যে জড়-বাদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই তাহার এত অপযশ, তাহা নহে। বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করার অপরাধেই চার্ব্বাকের অনন্ত অব্দব্যাপী বিড়ম্বনা। সাংখ্য দর্শন জড়-বাদী (materialistic and atheistic) এবং জৈমিনী-দর্শনও নিরীশ্বর-সেবী। তথাপি ঐ সকল দর্শন বেদের প্রমাণ স্বীকার করে বলিয়া, আস্তিক দর্শনের পর্য্যায়ে স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক ধর্ম্মপ্রচার করিলেও, বেদাবমাননার জন্য ঘৃণিত নাস্তিক পর্য্যায়ে উপেক্ষিত হইতেছে।

দর্শনশাস্ত্রের ঐতিহাসিক ধারা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আবহমান যুগ ধরিয়াই চিন্তারাজ্যে একটি প্রবল দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। এই দ্বন্দ্ব Empiricism এবং Rationalismএর দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ মানবের চিন্তা জড় বা চৈতন্য কাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিবে। এই সমস্যার কুহক কিন্তু আজও মিটিয়া যায় নাই। প্রাচীন গ্রীকদর্শনে Heracletus প্রভৃতি বলিলেন, সকলই পরিবর্ত্তনশীল; আর অমনি Permenides প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন, ধ্রুব পদার্থ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। দ্বৈত, অদ্বৈত, প্রভৃতি বহু বিপরীত মতামতই আজ পর্য্যন্ত মানব মনকে নিরুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। চার্ব্বাক বলিলেন জড়ই সত্য পদার্থ, চৈতন্য জড়েরই বিকার মাত্র। যথা—

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনিলানলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে॥
কিম্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশোঽহ সমীতি সমানাধি করণ্যতঃ॥
দেহস্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোঽয়ং ইত্যুক্তিঃ সম্ভবে দৌপচারিকী॥

—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহঃ।

দার্শনিকতা হিসাবে চার্ব্বাকের মতগুলি বিশেষ সুদৃঢ় নহে। তাহার প্রায় সব সত্যটুকুই উপমান বা analogyর উপর প্রতিষ্ঠিত। উপমান, অনুমান শ্রেণীর প্রমাণের অন্তর্গত; কিন্তু চার্ব্বাক সেই অনুমান আদৌ গ্রহণ করেন না। চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অন্নখণ্ডের সহিত শর্করা সংযোগ করিলে যেমন মদের মাদকতা-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ মস্তিষ্ক অর্থাৎ চতুর্ভূতের সহায়তায় চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান জড়বাদিগণ বলেন, যকৃৎ যেমন পিত্ত উৎপাদন করে, মস্তিষ্কও তেমনি চিন্তারাশির উৎপত্তি করিয়া থাকে। (The brain secrets consciousness as the liver secrets the

ble.) তাঁহারা কেন যে ভাবিয়া দেখেন না যে, মদ-শক্তি ও চৈতন্য একপ্রকার পদার্থ নহে। মদশক্তি শক্তি হইলেও তাহা জড় শক্তি তাহার সহিত চৈতন্যের কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। সে কারণ, তাহাদের উপমান (analogy) দৃশ্যতঃ লোভনীয় হইলেও, কার্য্যতঃ তাহা বিচার-সহ নহে। চৈতন্য যদি ভূত বা ভৌতিকের ধর্ম্ম হইত, তবে ভূত বা ভৌতিকের ধর্ম্ম তাহার বিষয় হইত না,—যেমন রূপ কখনও নিজের বা পরের রূপ দেখে না। দর্শন-সারথি শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে, যদি আত্মা এবং দেহের একই গুণ হইবে, তবে মৃত-দেহে আত্মার গুণ থাকে না কেন? অবয়ব প্রভৃতি গুণ যতক্ষণ দেহে থাকে, ততক্ষণই থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পর ও জীবনী শক্তি থাকে না। রূপ প্রভৃতি অন্যে অনুভব করিতে পারে কিন্তু অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতির আত্মার গুণ, আত্মা স্বয়ং ভিন্ন, অন্যে অনুভব করিতে পারে না। পঞ্চভূত জ্ঞানের বিষয় বটে কিন্তু জ্ঞান পঞ্চভূতের গুণ নহে। পঞ্চভূত পঞ্চভূত জানিতে পারে না। যেমন নর্ত্তকী নিজের স্কন্ধের উপর নৃত্য করিতে পারে না, কিম্বা অগ্নি আপনাকে পুড়াইতে পারে না। সর্ব্বাবস্থায় আত্মার নিত্যতাই ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

তবে চার্ব্বাকের যুক্তি-শাস্ত্র অর্থাৎ Epistemology অথবা Logic বড়ই চমৎকার। ভারতীয় সমুদায় দর্শনই কতকগুলি সাধারণ মত পোষণ করিয়া থাকে। যথা—আত্মা, পুনর্জন্ম বা সংসারের অসারতা, তজ্জন্য মোক্ষ, আত্মার অবিনশ্বরতা, কর্ম্মফল, ত্রৈ-গুণ্য, এবং অনুমানাদি প্রমাণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন সহস্র বৎসর দ্বন্দ্ব বিতণ্ডা করিয়াও চার্ব্বাক ইহার কোন দিকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। চার্ব্বাক চিরকালই স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছেন। ভারতের সাধারণ গ্রাহ্য চারিটি প্রমাণের মধ্যে কেহ কেহ উপমাণকে অনুমানের প্রতি প্রসব জ্ঞান করিয়া, তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন, যথা—প্রত্যক্ষ (perception) অনুমান (inference) এবং শব্দ (authority)। কিন্তু চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমানই স্বীকার করেন না। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষের পোষকতার যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অনুমানাদি প্রমাণ খণ্ডণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া চার্ব্বাক দর্শনকে শুধু মূর্খতার আধার বলা যায় না। মূর্খের হৃদয়ে যুক্তি নিপুণতা এত গভীর ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে না। বর্ত্তমান ইউরোপীয় Empiricist দর্শনের মত, চার্ব্বাক deductive Logic অস্বীকার করেন।

Deductive Logic বিশ্বজনীন সম্বন্ধ বা universal pervatian এর আশ্রয় লইয়া বিচার করিয়া থাকে। ইহাকে ব্যাপ্তি বা universal proposition নামে অভিহিত করা হয়। Major term কে ব্যাপক বা সাধ্য বলা হয় এবং middle term কে ব্যাপ্য, লিঙ্গ, সাধন হেতু প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, Minor term বা পক্ষই (the subject of inference) আমাদের সিদ্ধান্তের বিষয়। ব্যাপ্তিতে ব্যাপকের সহিত ব্যাপ্যের যে বিশেষ সম্বন্ধ অর্থাৎ middle term এর সহিত (major term) এর যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে—তাহাকে ব্যাপ্তির উপাধি বলে। যদি ব্যাপক (major term) ব্যাপ্য (middle term) কে নিরন্তর ভাবে ব্যাপিয়া রাখিতে পারে (Distributed middle) তবেই আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। যথা—

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

এই Enthemym কে Sillogism এ পরিণত করিবে।

(যেখানে ধূম আছে সেখানে অগ্নি আছে

পর্ব্বতে ধূম আছে

সুতরাং পর্ব্বতে অগ্নি আছে।

এখানে ধূমের সহিত অগ্নির নিরন্তর সম্বন্ধ (universal pervations) আছে। অর্থাৎ অগ্নি আছে বলিয়াই ধূম আছে। ব্যাপ্তিটী নির্ভুল। সে জন্য আমাদের সমুদায় সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইল। এখানে major term অগ্নি middle term ধূমকে নিরন্তর রূপে ব্যাপিয়া আছে। এবং সেই middle term ধূম minor term পর্ব্বতের সহিত বর্ত্তমান। সুতরাং পর্ব্বতে অগ্নি আছে। ধূম অগ্নির বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

আর যদি বলি "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে যেখানে অগ্নি আছে সেখানেই ধূম আছে। একথার দোষ এই যে ধূম ত অগ্নিকে ব্যাপিয়া রাখিতে পারে না। অগ্নি থাকিলেও ধূম না থাকিতে পারে। যথা লোহিতো গুপ্ত অয় গোলক অগ্নিময় হইলেও তাহাতে ধূম নাই। আমাদের ভ্রমময় ব্যাপ্তি আমাদিগকে বিপথে চালাইতেছে। কেন এরূপ হয় ?

কারণ আমরা ভুলিয়া যাই যে, ধূম সর্ব্বতোভাবে অগ্নির স্বরূপ নহে। তৃতীয় একটি আর্দ্র পদার্থই ধূমের উৎপত্তি করিতেছে। এই আর্দ্রতারূপ উপাধিই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। এই উপাধির জ্ঞানই আমাদিগকে বিপথ হইতে রক্ষা করিবে। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে এই উপাধি বর্ত্তমান ছিল এ দৃষ্টান্তে তাহা বর্ত্তমান নাই। কাজেই এ বিভ্রম। এখন বুঝা গেল যে উপাধি (condition) সর্ব্বদাই ব্যাপক এর (major term) সহিত বিচরণ করে কিন্তু ব্যাপ্য বা middle termএর সহিত না থাকিলেও না থাকিতে পারে। আর ব্যাপক (major term) উপাধি সঙ্গে না লইয়া কদাচিৎ পথে বাহির হয়। ইহাই অনুমান বা Inferential knowledge

আমরা এখন বুঝিবার চেষ্টা করিব যে চার্ব্বাক কেন অনুমানকে অস্বীকার করিতেছে। যদি ব্যাপ্তি সম্পূর্ণ উপাধি বর্জ্জিত হইত তবে আমাদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সফল হইত। কিন্তু এই উপাধি না থাকিলে ব্যাপক এবং ব্যাপ্যের—স্থির সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা যায় না। চার্ব্বাক বলে "তস্মা দ বিণা ভাবস্ত দুর্বোধতয়া নানু মানস্যাবকাশঃ।" অর্থাৎ অতীত এবং অনাগত কে যখন কেহ জানে না তখন ব্যাপ্তি জ্ঞান বা অবিনা ভাবের জ্ঞান (knowledge of universal pervation) সম্ভবপর নয়।

অনুমান সিদ্ধজ্ঞান এই ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপ্তি জ্ঞান ত দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে এ বিশ্বজনীন ব্যাপ্তির জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল ? অবশ্যই ইহা প্রত্যক্ষ দ্বারা লাভ হয় না। কারণ যদি বহিঃপ্রত্যক্ষ দ্বারা এ জ্ঞান লাভ হইবে তবে পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ স্থাপন করিবে। তাহা হইলে এ জ্ঞান অতীতে বা ভবিষ্যতে পৌছিতে পারিল না। শুধু বর্ত্তমান লইয়া সীমাবদ্ধ থাকিল। অতএব বহিঃপ্রত্যক্ষ আমাদিগকে ব্যাপ্তি জ্ঞান দিতে পারে না।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোন জাতি বিষয়ক জ্ঞানও দিতে পারে না। আর যদিও দিতে পারে তবে সে জাতি জ্ঞান হইতে আমরা ত ব্যক্তির জ্ঞানে পৌছিতে পারি না। ব্যক্তিতে আমরা বহু বিশিষ্টতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি। কিন্তু জাতি কি সেই সকল বিশিষ্টতার কথা বলিয়া দিতে পারে? মনুষ্য এই জাতিবাচক পদার্থে যাহা বুঝিয়া থাকি তাহাতে ত অর্ব্বাচীনের অজ্ঞানতা খুঁজিয়া পাই না। তবে মনুষ্য জাতি দেখিয়া কি উপায়ে অর্ব্বাচীনে পৌছিব? অন্ততঃ প্রত্যক্ষ দ্বারাও এ জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। কারণ মন বহিরিন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কৈ মন ত পদার্থের চতুর্থ অবয়ব (fourth dimension) বা অষ্টম বর্ণের (eighth colour) কল্পনা করিতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে এই ব্যাপ্তি জ্ঞান উপলব্ধি করিতে হইলে আর একটা ব্যাপ্তি পূর্ব্বেই ধরিয়া লইতে হইবে। এরূপে অনন্ত ব্যাপ্তি আসিয়া যে অনবস্থ দোষের সৃষ্টি করিবে। (Petitio principii).

তবে কি বলিব এই ব্যাপ্তি জ্ঞান, শব্দ বা বেদ সিদ্ধ? আমরা ত কেহই জানি না, কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের কথা মানিতে হইলেও অনুমান দ্বারা তাহার সম্ভাব্য বিচার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই দেখাইলাম, অনুমান কেমন ভ্রম-সঙ্কুল। প্রায় সমুদায় প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তার বিষয়েই কত মতবাদ ও বিতণ্ডা চলে। তাহা ব্যতীত শব্দ ত কোন অনন্ত পদার্থ নহে। পদার্থের বিনিময়ে নাম-বাচক শব্দ প্রয়োগ মাত্র। কাজেই শব্দ, প্রকৃত ব্যাপ্তি-জ্ঞান আনিয়া দিতে পারিল না। অনেক সময় শব্দ কত অযুক্তি এবং ভ্রম সঙ্কুলতায় পূর্ণ থাকে। সে সকল শব্দকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আর যদি শব্দই ব্যাপ্তি জ্ঞানের কারণ হইবে, তবে ত কাহার নিকট না শুনিলে 'অগ্নিতে হাত পুড়ে এবং আমার হাত পুড়িয়াছে 'এই জ্ঞান আদৌ জন্মিতে পারে না।

উপমান দ্বারাও ব্যাপ্তি সাধিত হয় না। কেন না উপমানও একটি নাম মাত্র। সেই নামধারী বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া উপমানসিদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়। পরন্তু, তুলনা অনুমানের অবস্থান্তর মাত্র। কিন্তু আমরা চাই উপাধিহীন ব্যাপ্তি (universal relation)। ব্যাপ্তি না পাইলে যে আমাদের অনুমান-সিদ্ধ-জ্ঞান আদৌ লাভ হইবে না। সুতরাং আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে ব্যাপ্তির কোন অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে, আমরা অনুমানের পথে অগ্রসর হইতে অক্ষম। মানব মন সমুদায় উপাধি তন্ন তন্ন করিয়া না জানিয়া, কোন সাহসে উপাধি আছে কিম্বা নাই এই কথা বলিবে, মানবের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেবলমাত্র অনুমান দ্বারা একটি সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে ত আবার সেই অনবস্থ দোষ বা যুক্তির নাগরদোলা (*petitio principii*) আসিয়া উপস্থিত হইবে।

এখন কি উপায়ে এ সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে? 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' হইলেও স্থল বিশেষে এরূপ অনুমান মিথ্যা হইতে পারে। যেমন শীতকালে নদীতে ধূম্রাকার কুয়াসা দেখিয়া অগ্নি আশঙ্কা করা। তাই চার্ব্বাক বলেন যে, প্রকৃত সত্য প্রত্যক্ষ দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে। "না প্রত্যক্ষং প্রমাণম্"।

এ কথার উত্তরে সাংখ্যকারিকার বলেন—

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয় ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥"

অর্থাৎ দূরত্ব, সামীপ্য, ইন্দ্রিয়াদির বিকৃতি, মনের অনবধানতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধানতা, অভিভব ও সমশ্রেণীত্ব হেতু আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিতে পারে না। চার্ব্বাক একবার বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া, পূর্ব্ব কথারই সূত্র ধরিয়া বলেন যে, অতীতের এবম্বিধ ঘটনা আমাদের স্মৃতিপটে থাকে বলিয়াই পরবর্ত্তী সময়ের এতাদৃশ ঘটনার সত্য বিষয়ে আমরা সন্দিহান হই। আমরা আশার পথে চাহিয়া থাকি, যদি বা আমাদের বর্ত্তমানের দ্রষ্টব্য সঠিক্ হয়। এখানে কোন ব্যাপ্তি-জ্ঞানের যোগাযোগ সম্বন্ধ নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তি আজ আছে, কিন্তু কল্য যে থাকিবে বা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে ছিল, তাহা কে বলিবে? কাজেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয়েরই সত্যাসত্য ঘোষণা করা যায় না।

এই ত চার্ব্বাকের কথা। Bacon John Stuart Mill প্রভৃতিও এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও বলিয়াছিল যে per simple Enumeration অর্থাৎ একটির পর একটি করিয়া পদার্থকে দেখিয়া, তাহাদের এক রূপ্যতার স্মৃতিই আমাদিগকে জ্ঞান-রাজ্যে আনয়নএর। যথা—

A is X; A_1 is X, A_2 is X

. all A's are x

এইরূপেই আমরা জানিতে পারি যে, মানুষ মরণশীল, বায়স কৃষ্ণবর্ণ, হংস শ্বেতবর্ণ। যদি আমাদের প্রত্যক্ষের জীবনে ইহার ব্যাভিচার দেখি, তবে অবশ্যই আমাদের জ্ঞান চূর্ণ হইয়া যাইবে। আমরা নূতন জ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। আমাদের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি সাপেক্ষ, (empirical)।

এখানে আমরা চার্ব্বাকের সহিত empiricistগণের একটু পার্থক্য দেখিতে পাই। John Stuart Mill প্রভৃতি অন্ততঃ এক প্রকারের অনুমান স্বীকার করিয়াছেন—inference by induction। তাঁহারা তাঁহাদের inductionএ 'A'এর সহিত 'X'এর অবিনা সম্বন্ধ (necessary connection) আছে কিনা, তাহা তাঁহাদের যুক্তি-প্রক্রিয়া অর্থাৎ methods দ্বারা যাচাই করিয়া লইয়া তবে অনুমান সিদ্ধ করেন। কিন্তু চার্ব্বাক তাহাতে সম্মত নহেন। চার্ব্বাকের নিকট প্রত্যক্ষই একমাত্র জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানাধিগমনের একমাত্র উপায়। আমরা আজ রামকে, কাল শ্যামকে, পরশ্ব হরিকে মরিতে দেখিয়া মৃত্যুই মানুষের পরিণতি বলিয়া ধরিয়া লইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের দুর্ব্বল মন psychologically এরূপ ভাবিতে পারে। কিন্তু logic কোন সাহসে এই মৃত্যুকে সাধারণ বলিয়া ঘোষণা করিবে? আমরা যাহা psychologically করি, তাহাকে কি logical কর্ত্তব্যের আসনে তুলিতে পারি? চার্ব্বাক major premios হইতে ব্যাপ্তি বা অবিনা সম্বন্ধকে (universal pervation) নির্ব্বাসিত করিয়া, অনুমানকে অনবস্থ-দোষ-দুষ্ট

(petitio principii) বলিয়া যতই কটূক্তি করুক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সকলকেই অনুমান মানিয়া লইতে হয়। বাচস্পতি মিশ্র সত্যই বলিয়াছেন যে, যদি চার্ব্বাক অনুমানকে পরিত্যাগ করিবেন, তবে মদের মদশক্তিবৎ কি প্রকারে ভূতচতুষ্টয়ের সমবায়ে চৈতন্য কল্পনা করেন? অনুমান না থাকিলে যে মানুষ পশু-পদবীতে পড়িয়া যাইবে। অনুমানেই মানবের rationalityর প্রতিষ্ঠান। চার্ব্বাককে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতে হয়।

চার্ব্বাকের এবম্বিধ যুক্তি প্রণালী, ইহাঁকে ধর্ম্ম বিষয়েও অন্ধ করিয়াছে। চার্ব্বাক্ আত্মা মানেন না; কাজেই তাঁহার পুনর্জন্ম বা মুক্তির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ কারণে জীবন-ব্যাপী ভোগ সুখই তাঁহাদের চিন্তার বিষয়। প্রত্যক্ষ দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাই চার্ব্বাক ঈশ্বরের মহিমায় বঞ্চিত। চার্ব্বাকের মতে "লোক সিদ্ধঃ রাজা পরমেশ্বরঃ।" চার্ব্বাক মতে মানবের শারীরিক বন্ধন ভিন্ন আত্মার কোন বন্ধন নাই। সে কারণ মানুষ কেবল রাজার নিকট মস্তক নত করে এবং মোক্ষের বাসনা জন্মিলে, আত্মম্ভরী রাজার দাসত্ব পাশ ছেদন করিতে চেষ্টা করে। ঠিক এই ভাবেই Augustus Comte বলিয়াছিলেন যে, Henceforth mans knee shall never bend except before a woman। চার্ব্বাক মতে শরীর ত্যাগেই মানবে মোক্ষ, তাই তাঁহারা বলেন—"দেহচ্ছেদঃ মোক্ষঃ"।

ভারতের সর্ব্ব দর্শনই পাঞ্চজন্য ঘোষে সংসারের দুঃখের গীতি গাইয়া আসিতেছিল। ভোগকে শুধু মরীচিকা, শুধু প্রবঞ্চনা বলিয়া আসিতেছিল। এই নিদারুণ নৈরাশ্য (pessimism) কৌপীনবন্তকে খলু ভাগ্য বন্ত বলিয়া মানুষের বাস্তব জীবনকে কর্ম্মহীন, উৎসাহহীন আলস্য পরতন্ত্র এবং উদাসীন করিয়া তুলিতেছিল। "নির্দ্ধশালী বীজের মত জীবনটাকে পুড়াইয়া থাক্ করিতে পারিলেই যেন সর্ব্বার্থ সাধন হইল।" চার্ব্বাক এই নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আশার বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ভয়ে, দুঃখ শোক চরণে দলিয়া, মানুষের কর্ম্ম শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানুষকে একটা অনুপ্রাণনার সঞ্জীবন ধারা দিবার জন্যই, নৈরাশ্যকে দূরে রাখিয়া দুঃখ ও শোকের পাশাপাশি ভোগ ও সুখকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তণ্ডুলে তুষ সংযুক্ত থাকে বলিয়া তণ্ডুল পরিহার্য্য নহে। জগতের দুঃখ রাশিকে যত উপেক্ষা করিতে পারিবে, ততই ভোগের দ্বারা লভ্যের অঙ্ক পূরণ করিতে পারিবে। ইহা "দুঃখ ত্রয়া ভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা" নহে, কিন্তু মানুষের মত আশাময় জীবনযাত্রা বটে। আসে দুঃখ আসুক। অনাগত ভয়ে ত্রস্ত হইয়া "গৃহীতৈব কেশেষু মৃত্যুণা ধর্ম্মমাচরেৎ" করিয়া কি হইবে? Epicurus বলিয়াছিলেন—"Gods are either non-exfistent or absolutely indifferent about the affairs of man"। অতএব কর্ম্মই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ভারতের Hedonistic দার্শনিক "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" চার্ব্বাক-মত প্রচার করিলেও তাহার একটু দুর্ব্বলতা ছিল। ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ অনেক মোহজালে জড়িত হইয়া পরে। সেই কারণে কুলীশ কঠিণ Kant কেও বিধাতার আসন পাতিয়া দিতে হইয়াছিল। চার্ব্বাক বলিলেন—"কণ্টকজন্যাদি দুঃখম্ নরকম্" এবং "অঙ্গনা লিঙ্গনাদি জন্যং সুখং পুরুষার্থঃ"।

চার্ব্বাক আরও বলিলেন যে, যাহারা সুখ পরিহার করিয়া দুঃখকে বরণ করিয়া লয়, তাহারা অবশ্যই মূর্খ।

ত্যজ্যং সুখং বিষয় সঙ্গম জন্ম পুংসাম।
দুঃখো পসৃষ্টমিতি মূর্খ বিচারণৈষা॥

জানিয়া শুনিয়া যাহারা জ্যোতিষ্টমাদি যজ্ঞ করিয়া অশেষবিধ কষ্ট স্বীকার করে এবং অর্থের বৃথা ব্যয় করে তাহারা প্রবঞ্চিত।

অগ্নিহোত্রস্ত্রয়োবেদা স্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠণম্।
বুদ্ধি পৌরুষ হীনানাম্ জীবিকা ইতি বৃহস্পতিঃ॥

চার্ব্বাকের শেষ উপদেশ—

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনম কুতঃ॥

গ্রীকদেশে Sophist গণের কার্য্যাবলী ইউরোপের জার্ম্মান দেশে Illuminationist এবং ফরাসী দেশে Positivist গণের জাগারণ কতকটা এই প্রকার হইয়াছিল; মানুষের কর্ম্ম শিথিল অসারতা অনেকটা অপনোদনের জন্য, কিন্তু, যেখানে ভগবানের আসন নাই, সেখানে জ্ঞানে স্থায়িত্ব নাই। তাই ভারতের মানুষ কিন্তু আজও বলিতেছে—

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়ণায়।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী।

অনধীনতা না স্বাধীনতা ?

১।

আমরা যে স্বরাজ চাহিতেছি, তাহা কি কেবল মাত্র একটা অনধীনতার অবস্থা, না স্বাধীনতার অবস্থা? আমাদের ভাষায় এই "অনধীনতা" শব্দটি নাই। ইংরাজিতে যাহাকে ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স (independence) কহে, এখানে তাহাকেই বাঙ্গালাতে "অনধীনতা" কহিতেছি। ইংরাজি ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স (independence) শব্দটি অভাবাত্মক। ডিপেণ্ডেন্সের অথবা অধীনতার অভাবকেই ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স কহে। প্রকৃত পক্ষে, ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স শব্দে একটা নিরাকার শূন্য অবস্থা বুঝায়। আমাদের দেশের বহুতর স্বরাজ-পন্থীরা এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, বলিয়া আশঙ্কা হয়।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে আমরা ইংরাজের অধীন হইয়া আছি। সুতরাং এ অবস্থাটা একটা অধীনতার অবস্থা। ইংরেজের অধীনতা মুক্ত হইলেই, আমরা ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট্ (independent) হইব। এই অবস্থাকে যদি স্বরাজ বলেন, তাহা হইলে ইংরাজ-রাজের উচ্ছেদেই স্বরাজ হইয়া যায়। যে মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনের অবসান হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের স্বরাজ লাভ হইবে।

ইহাই কি স্বরাজ? এভাবে প্রশ্নটা তুলিলে, অনেকেই কহিবেন—"তা ঠিক নয় বটে, কিন্তু ইংরাজ-রাজকে না সরাইয়া ত আমাদের স্বরাজলাভ হইবে না, অতএব ইংরাজ-রাজের উচ্ছেদ স্বরাজ লাভের অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্ববৃত্ত কর্ম্ম।" কেহ কেহ হয়ত এমনও কহিবেন যে "এই স্বরাজ ত আমাদের আছেই, জীবের মুক্তি যেমন নিত্যসিদ্ধ, আমাদের স্বরাজও সেইরূপ। বেদান্ত কহেন, কোনও ক্রিয়ার দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায় না। মুক্তি "জন্যবস্তু"—অর্থাৎ কার্য্য বিশেষের ফল-নহে। জীব মায়াবশে আপনাকে বদ্ধ বলিয়া ভাবিতেছে। এই মায়া বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান, জীবের আত্মজ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে বলিয়া, নিত্যমুক্ত-স্বভাববান যে জীব, সেও আপনাকে বদ্ধ বলিয়া অনুভব করিতেছে। এই আবরণ মোচন করিলেই, এই অজ্ঞানতা দূর হইলেই, জীবের নিত্যসিদ্ধ মুক্ত অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সেইরূপ, আমাদের স্বরাজও নিত্যসিদ্ধ। আমরা প্রকৃত পক্ষে ত স্বাধীনই আছি, কেবল মোহবশতঃ ভাবি, ইংরাজ আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যেদিন এই মোহ কাটিবে, সেই মুহূর্ত্তেই ইংরাজের শাসন "অরুণ 'উদয়ে আঁধার যেমন' তেমনি, আপনা হইতে নষ্ট হইবে, আর সেই মুহূর্ত্তে আমরা স্বরাজ পাইব।"

যারা এরূপ ভাবেন, স্বরাজ বলিতে তাঁরা একটা ভিতরকার অবস্থাই বুঝেন, বাহিরের কোনও বিশেষ আকারের বা প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা অবস্থা বুঝেন না। চিত্তবাবু বরিশালে যে স্বরাজের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আর গান্ধি মহারাজও মাঝে মাঝে যে সকল কথা কহেন, তাহা হইতে স্বরাজের এই মর্ম্মই পাওয়া যায়।

স্বরাজ যদি এই আন্তরিক ভাব বা অবস্থাই হয়, তাহা হইলে বাহিরের কোনও প্রকারের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ইহার কোনও সম্পর্কই থাকে না। ইংরাজ রাজ্য শাসন করুক, তাহাতে ত আমার চিত্তের এই সহজ-সিদ্ধ স্বাধীনতার সঙ্কোচ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাহিরের বিষয় ও সম্বন্ধ সকলকে যদি আমি আমার মন হইতে সরাইয়া রাখিতে পারি, হংস যেমন জলে চরিয়াও জলে ভিজে না, সেইরূপ আমিও ইংরাজের আইনকানুনের মধ্যে বাস করিয়াও তাহা হইতে যদি একান্ত নির্লিপ্ত থাকিতে পারি, সে অবস্থায়, ইংরাজ-শাসনের অস্তিত্বে আমার স্বরাজত্বের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না।

এই যে ভিতরকার স্বরাজ, এই স্বরাজ-লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথ ত নন্-কো-পারেষণ বটেই। নন্-কো-পারেষণ বা অসহযোগ অর্থ আমরা ইংরাজের শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে কোনও প্রকারের সাহচর্য্য করিব না। এই সাহচর্য্য করিলেই তাহার ফলাফলে জড়াইয়া পড়িব। ইংরাজের সাহচর্য্য করিয়া আমাদের যতটুকু লাভ হইবে, তাহার লোভে আমরা এই শাসনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িব। এই লাভের হানি হইবার আশঙ্কায় আমরা সতত কাতর হইয়া রহিব। অর্থাৎ ইংরাজ শাসনের অধীন হইয়া থাকিব। এই ভাবেই জীব বহির্বিষয়ের সঙ্গে জড়াইয়া আত্মহারা হয়। এই পথেই জীবের দেহাত্মধ্যাস জন্মে, দেহকে আত্মা বলিয়া ধারণা হয়। এই দেহঅধ্যাসের নামই মায়া। এই মায়াই জীবের বন্ধ-হেতু। এইখানেও সেই কথা। ইংরাজের শাসন-শক্তি আমাদের অন্তরে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহারই ফলে ইংরাজ আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আর ইংরাজ-শাসনের সুখদুঃখের ভাগী হইতেছি বলিয়াই ত ইংরাজ-শাসন আমাদের চিত্তকে দখল করিয়া আছে। এই শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে আমরা সাহচর্য্য করিতেছি বলিয়াই,

তাহার ফলাফল আমাদিগকে আশ্রয় করিতে পারিতেছে। সুতরাং এই সাহচর্য্য নষ্ট হইলে, ইংরাজ শাসনের ফলাফলের সঙ্গে আর আমরা জড়াইয়া পড়িব না। তখন আমাদের যে নিত্যসিদ্ধ স্বরাজ বস্তু, তাহা স্বতঃই লাভ হইবে। আর এই স্বরাজ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মার বা চিত্তের উপরে ইংরাজ রাজের বর্ত্তমান প্রভাব আর থাকিবেনা। আমরা তখন স্বাধীন হইব।

এই স্বরাজ বস্তু বৈদান্তিক মুক্তির মতন একান্ত অন্তরঙ্গ বস্তু। ইংরাজ শাসনের ভয় ও লোভ এই দুটি হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে পারিলেই এই স্বরাজ-লাভ হইবে। এই জন্যই চিত্ত বাবু কহিয়াছেন, স্বরাজ কোনও শাসন-ব্যবস্থা বা system of administration নহে।

কিন্তু দেশের লোকে সত্যই কি স্বরাজ বলিতে এই অন্তরঙ্গ বস্তু বুঝে? অন্ততঃ গান্ধি মহাত্মার আবির্ভাব ও চিত্ত বাবুর নবজীবন লাভের পূর্ব্বে, আমরা কেহই স্বরাজ বলিতে এই বৈদান্তিক মুক্তি বুঝি নাই। আর বৈদান্তিক মুক্তির তাৎপর্য্য যাহারা বুঝেন, তাঁরা ইহাও বলিবেন যে, এই স্বরাজ লাভের জন্য বর্ত্তমান "শয়তানী" ব্রিটিশ রাজের উচ্ছেদ সাধন অত্যাবশ্যক নহে। এই স্বরাজ যাঁর লাভ হইয়াছে, তিনি বামদেব ঋষির মতন—আমিই ইংরাজ হইয়াছি ভাবিয়া, এই ইংরাজ শাসনকেই আত্মশাসন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কারণ ভূমাকে যে প্রাপ্ত হয়, তার যে সবাই আপন। তার নিকটে আবার আত্মপর, স্বদেশী-বিদেশী, ভেদ-প্রতিষ্ঠিত কোনও সম্বন্ধ ত থাকে না।

দেশের লোকে স্বরাজ বলিয়া যে বস্তুর পশ্চাতে ছুটিয়াছে, তাহা এই একান্ত অন্তরঙ্গ বস্তু নহে। তারা আর কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক, এটা অন্ততঃ খুব দৃঢ় করিয়াই বুঝিয়াছে যে, ইংরাজের শাসন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাদের স্বরাজ আসিবে না। ফলতঃ, আপাততঃ ইহাই মনে হয় যে, ইংরাজ-শাসনের উচ্ছেদকেই ইহারা স্বরাজ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

২

এই সেদিন "অমৃতবাজার পত্রিকা" গণতন্ত্র স্বরাজের কথার আলোচনা করিতে যাইয়া কহিয়াছেন, ও সকল কথা এখন তোলা কেন? আগে ইংরাজের অধিকার হইতে নিজের দেশটা জয় করিয়া লও—re-conquer the country—তার পর এই দেশের শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র বা, অন্যবিধ আকার ধারণ করিবে, সে কথার বিচারের সময় আসিবে। এখন ইংরাজের অধিকার হইতে দেশটাকে নিজের অধিকার কিসে আইসে, তাহাই কেবল আমাদের ভাবিবার ও করিবার কথা। "অমৃত বাজার পত্রিকার" মনীষী লেখকের মতে, ইংরাজ-রাজের উচ্ছেদ বা অবসানই "স্বরাজ"। ইহা একটা অভাবাত্মক বস্তু। স্বরাজ অর্থ ঠিক স্বাধীনতা নহে, কিন্তু অনধীনতা মাত্র। এখানে স্বরাজ শব্দ ইংরাজি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স শব্দেরই অনুবাদ। সেলফ্-গভর্ণমেণ্টের—self-government এর প্রতিশব্দ নহে।

প্রয়াগের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' (Independent) নামক ইংরাজি দৈনিক পত্র, গান্ধি মহারাজের মুখপত্র বলিলেও হয়। এই পত্রে সর্ব্বদা মহাত্মার মতামত অভিব্যক্ত ও সমর্থিত হইয়া

থাকে। এই "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্" পত্রও গণতন্ত্র স্বরাজের আলোচনা করিতে যাইয়া, "অমৃতবাজারের" মতেরই কতকটা অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনিও এ সময়ে এ সকল বিষয়ের আলোচনার বিরোধী। "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্" কহিতেছেন, ইংরাজ-রাজ গিয়া যদি হিন্দুরাজ বা মোছলেম রাজ, বা শিখরাজই হয়, তাতেই বা আসিয়া যাইবে কি? হিন্দু, মুসলমান্, শিখ—এরা ত আমাদেরই লোক। এদের রাজ ত আমাদেরই রাজ হইবে। অর্থাৎ, ইংরাজ রাজের উচ্ছেদ হইয়া, তাহার স্থলে, হিন্দু, মসলমান, শিখ, ভারতের যে কোন সম্প্রদায়ের, বা জাতির, বা প্রদেশের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তাহাই আমাদের স্বদেশীয় রাজ হইবে। সুতরাং তাহাই ত স্বরাজ। ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে।

এরূপ ভাবে যাহারা এই বিষয়টির বিচার-আলোচনা করেন, বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা সপ্রমাণ হয়, ইহা স্বীকার করি। আর দেশের মধ্যে যে এই অসহিষ্ণুতা সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহাও জান এবং বুঝি। কিন্তু এই অসহিষ্ণুতা নিবন্ধন, ভবিষ্যতের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া, আশু প্রতীকারের আশায়, যার-তার আশ্রয় গ্রহণ করা, নীতিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" কহিতেছেন, আগে ইংরাজের হাত হইতে নিজেব দেশটাকে উদ্ধার করিয়া আন, তারপরে শাসন-ব্যবস্থার কথা ভাবিও। কাড়িয়া আনিবে কারা? কাড়িয়া আনিতে হইলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? এ সকল কথা কি ভাবিতে হইবে না? কেবল যোগ-বলে—soul force দিয়া,—কি ইংরজেকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া বা সরাইয়া দিতে পারিব? যাঁহারা এরূপ যোগ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বরাজলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা লইয়া কোনও কথা বলা চলে না। কিন্তু যোগ-বলে কাম্য বস্তু লাভের জন্য এককোটি টাকা, এককোটি কন্‌গ্রেসের সভ্য, বিশলক্ষ চরকা সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় কি? অন্ততঃ ভারতের প্রাচীন যোগ-শাস্ত্রে এরূপ কথা কহে বলিয়া এ পর্য্যন্ত শুনি নাই। যোগীজনের অনিমা প্রাপ্তির জন্য চাপিবার যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না; লঘিমা প্রাপ্তির জন্য দেহাভ্যন্তরে বেলুনের মতন, হাইড্রজন গ্যাস ঢুকাইতে হয় না; দূরে যাইবার জন্য বিমান-পোত বা মটরগাড়ীর আবশ্যক হয় না, কাম্যবস্তুলাভের জন্য, কোন ও প্রকারের বাহিরের উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। ইচ্ছামাত্র যোগীজনের ঈপ্সীত লাভ হয়। ইহাই ত যোগের বাহাদুরী। আমাদের দেশের শাস্ত্র-সাধনায় ইহাকেই ত এতাবৎকাল যোগবল বলিয়া আসিয়াছে। যে soul force এর সফলতার জন্য কোটি রজত মুদ্রা, কোটি সভ্য ও বিশলক্ষ চরকার প্রয়োজন, যাহার জন্য স্তূপাকার বিদেশী বস্ত্রের আহুতির আবশ্যক, সে বস্তু আমাদের যোগশাস্ত্র জানে না। সুতরাং যোগবলে যে স্বরাজলাভ হইবে, একথা কেহ বিশ্বাস করেন কি না সন্দেহ।

আর যদি যোগবলে স্বরাজলাভ না-ই হয়, তবে ইংরাজের অধিকার হইতে দেশটা জয় করিবে কে, বা কাহারা? এই জয় করিতে হইলে কিরূপ সাজসরঞ্জামের আবশ্যক হইবে? আর যে বা যাহারা এ কার্য্য করিবে, সিদ্ধির পরে, তাদের পক্ষে কিরূপ নীতি বা পন্থা অবলম্বন করার সম্ভাবনা,—এসকল কথা এক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে।

৩

ইংরাজ নিজের শক্তিতে দেশটা অধিকার করিয়া আছে। এই শক্তিকে পরাভূত ও বিধ্বস্ত না করিয়া, আমরা দেশটা পুনরুদ্ধার করিতে পারিব কি? দেশটা re-conquer করা অর্থই, নিজেদের শক্তি দ্বারা ইংরাজেব শক্তিকে নষ্ট করা।

ইংরাজ যে শক্তির দ্বারা আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে কতকটা মায়িক,—একান্তই কায়িক নহে—একথা অস্বীকার করা অসাধ্য ও অনাবশ্যক। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ইংরাজ আপনার প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করিয়াই এই অদ্ভূত মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। রাজার ধনবল ও জনবল—কোষ ও দণ্ড—দেখিয়া, প্রকৃতি-পুঞ্জের অন্তরে যে শ্রদ্ধা ও ভয় প্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের প্রাচীনেরা, তাহাকেই "প্রতাপ" কহিতেন। ইংরাজিতে ইহারই নাম প্রেষ্টিজ। ইংরাজ-রাজের অশেষ ধন এবং অপরিসীম সিপাহী সান্ত্রী আছে, এই ধনের জোরে, এই সকল সৈন্যসামন্তের সাহায্যে, ইংরাজ সসাগরা ভারতভূমির অধীশ্বর হইয়া আছে,—ইংরাজের রাজ্যে এই জন্য লোকে বে আইনি কাজ করিতে ভয় পায়, এই জন্যই দুর্ব্বলে ইংরাজের দোহাই দিয়া প্রবলের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইতে পারে। এ সকল ভাব হইতেই এই অদ্ভূত মায়ার সৃষ্টি হইয়াছে। আজ যদি দেশের প্রকৃতিপুঞ্জের এ ধারণা নষ্ট হইয়া যায়, আজ যদি লোকে ইহা বুঝে যে ইংরাজের কোষ শূন্য হইয়াছে, তাহার সেনাবল নষ্ট হইয়াছে, তবে ইংরাজের বর্ত্তমান প্রতাপ আর থাকিবে না। প্রতাপ নষ্ট হইলে লোকের ভয়ও ভাঙ্গিয়া যাইবে। ভয় ভাঙ্গিলে, ইংরাজ যে অদ্ভূত মায়াজাল বিস্তার করিয়া, একদল মুষ্টিমেয় লোক লইয়া, দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া, এই বিশাল দেশটাকে হেলায় পদানত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আর সম্ভব হইবে না। সুতরাং যে মায়া-প্রভাবে ইংরাজ আমাদিগকে শাসন করিতেছে, কেবল মন্ত্র প্রভাবে, কেবল যাদুবলে, কেবল মুখের কথায়, বা মনের কল্পনায় বা সংকল্পে সে প্রভাব নষ্ট হইবে না। রোজা ডাকিয়া, বাগবাজারের পক্ষেও এই বিরাট, এই নিরেট ইংরাজ-শাসনের হাত হইতে দেশটাকে re-conquer বা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নহে।

অশেষ উৎপাত উপদ্রব করিবার শক্তি আছে বলিয়াই ইংরাজ এরূপ নিরুপদ্রবে ভারতে রাজত্ব করিতেছে। এ শক্তি তার যতদিন থাকিবে, ততদিন দেশটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া বা re-conquer করা অসম্ভব, অসাধ্য, কল্পনাতীত। ইংরাজ-প্রভুশক্তির পশ্চাতে যতটা সুসম্বদ্ধ, সুশিক্ষিত, সুপটু পশুবল রহিয়াছে, অন্ততঃ সে পরিমাণে সুসম্বদ্ধ, সুশিক্ষিত, সুপটু ও সশস্ত্র জনবল বা সেনাবল যতক্ষণ না সংগৃহীত হইতেছে, ততক্ষণ দেশটা re-conquer বা আবার নিজেদের অধিকারে আনার কল্পনা পর্য্যন্ত সাধারণ বুদ্ধির অতীত। আর যে সেনানায়ক বা যে সেনাদল এ কার্য্য করিবে, সে কি ইংরাজের শাসনদণ্ডটি কাড়িয়া লইয়া, আমাদের হাতে তুলিয়া দিবে, না নিজের কব্জার ভিতরেই আঁকড়াইয়া ধরিবে? যাঁরা এই re-conquer এর কথা তুলিয়া, স্বরাজের প্রকৃতি কি হইবে,—অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান সাধনার সাধ্য কি,—এবিষয়ের আলোচনার মুখ চাপিয়া দিতে চাহেন, তাঁরা কেবল ইংরাজকেই তাড়াইতে চাহেন, তার পরে যা হয় হউক, সে ভাবনা ভাবিতে রাজি নহেন।

তাঁরা অনধীনতা বা independence চাহেন, স্বাধীনতা বা self-dependence যে কি ইহা বুঝিতে চাহেন না।

৪

অনধীনতা লাভ করিতে হইলে, ভাঙ্গাই চাই, ভাঙ্গাই যথেষ্ট। যে বন্ধনটা আছে, যে শিকলটা গলায় বড় বাজিতেছে, তাহা কাটিতে বা ভাঙ্গিতে পারিলেই হইল। তারপর যা হয় হউক। স্বাধীনতার পথ কিন্তু কেবল ভাঙ্গার পথ নয়, সঙ্গে সঙ্গে গড়ার পথও। পরের অধীনতা নষ্ট করিয়া, স্ব'এর বা নিজের অধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—স্বাধীনতার সাধক ইহাই চাহেন। অধীনতার প্রাণ শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার অর্থ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা, ও সে সম্বন্ধকে রক্ষা করিবার উপায় বিধান করা। ইংরাজ একটা রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা, একটা শাসন-যন্ত্র, প্রজাবর্গের পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিজের ইচ্ছা ও শক্তি বলে সে সম্বন্ধকে রক্ষা করিতেছে। ইংরাজের অধীনতা এই শৃঙ্খলাকে আশ্রয় করিয়া, আমাদিগকে আসিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে। আমরা যখন স্বাধীন হইব, তখনও আমাদের নিজেদের উপরে নিজেদের এই অধীনতা, একটা রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা, একটা শাসন-যন্ত্র, একটা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া রহিবে। সুতরাং, এই শৃঙ্খলার সূত্রপাত, এই যন্ত্রের ছাঁচ, এই রাষ্ট্র সম্বন্ধের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা যদি এখন হইতে আমরা না করি, বা না করিতে পারি, কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের স্বাধীনতার বা স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে? সে অবস্থায় আমরা কেবল মাত্র অনধীনতাই লাভ করিতে পারিব, স্বাধীনতা ত পাইব না।

কি জীব, কি সমাজ, কিছুই একটা অভাবাত্মক বস্তুর উপরে, একটা শূন্যেতে, স্থিতিলাভ করিতে পারে না। যদি ইংরাজের অধীনতা ঘুচিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতার আশ্রয় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে, ইংরাজের শৃঙ্খল-মুক্ত হইতে না হইতে আর কাহারও শৃঙ্খলে আমরা বাঁধা পড়িবই পড়িব। সে কেহ স্বদেশীও হইতে পারে, বিদেশীও হইতে পারে, কে হইবে, কে জানে?

এদেশে দেশীয় কয়েদিদিগকে হাতে কড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পথ দিয়া লইয়া যায়। এই দড়িটা শ্বেতাঙ্গ জোহনের, কিম্বা কৃষ্ণকায় জনার্দ্দন সিংহের হাতে আছে, কয়েদি বেচারি এ বিচার করিয়া কোনও সান্ত্বনা পায় কি?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্বরাজ

(১৫)

১৮৯৪ সালে দ্বিতীয় নিকোলাস্ যখন রুশ্ সাম্রাজ্যের সিংহাসনারোহণ করেন, তাঁহার রাষ্ট্রে শক্তিবাদী বিপ্লব পন্থীর (Terrorists) অভাব ছিল না। আবার রাষ্ট্রের আইন মানিয়া, নিরুপদ্রব, বৈধ আন্দোলনদ্বারা জন সাধারণের জন্য ক্রমে ক্রমে একের পর আর এক অধিকার লাভের চেষ্টায় নিরত রাষ্ট্রনীতি-কুশল (gradualists) স্বদেশ-সেবকেরও অভাব ছিল না। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় "সাহিত্য সভা" লোকশিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত ছিল। "সাহিত্য সভা" রুশ রাষ্ট্রশক্তির

প্রতিকূল গণ্য হওয়াতে শাসনের তাড়নায় ১৮৯৬ সালে লোপ পায়। তদুপলক্ষে টলষ্টয় জনৈক রুশ মহিলাকে ১৮৯৬ সালে যে পত্র লেখেন তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত সহযোগিতা-বর্জ্জন-বাদের সারমর্ম্ম দিয়াছি। ঐ পত্র কিন্তু সম্রাট নিকোলাসের জীবিতকালে রুশ দেশে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। সেজন্য য়ুরোপে বা রুশ দেশে সহকারিতা-বর্জ্জন-বাদ অপ্রচারিত ছিল না। টলষ্টয় যখন কিছু নূতন কথা বলিতেন বা লিখিতেন য়ুরোপীয় সকল ভাষায় তাহা অনূদিত হইয়া সকল দেশে প্রচারিত হইত। এবার টলষ্টয় ঘোষণা করেন যে শক্তি মূলক রাষ্ট্রের তিরোধানের একমাত্র উপায় পূর্ব্বোক্ত নিরুপদ্রব, শক্তি হইতে মুক্ত, প্রেমে সুপ্রতিষ্ঠিত সহকারিতা-বর্জ্জন। বল বা শক্তির শাসন মানব সমাজ হইতে দূর করিবার জন্য বল বা শক্তির শরণাপন্ন হওয়া মূর্খতা। আবার, রাষ্ট্রের আইন মানিয়া জনসাধারণের জন্য ক্রমশঃ অধিকার লাভের চেষ্টাও আত্মপ্রতারণা। লক্ষ্যে উপনীত হইবার ঐ একমাত্র পথ—নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

টলষ্টয়ের প্রদর্শিত সহযোগিতা-বর্জ্জনের এই পথটাকে বল বা শক্তির উপদ্রব হইতে মুক্ত রাখিবার প্রয়াস, শুধু সুবিধাবাদীর কৌশল একরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। বল-প্রয়োগ টলষ্টয়ের ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। টলষ্টয়ের ধর্ম্মের প্রথম অনুজ্ঞা, প্রেম। টলষ্টয়ের ধর্ম্মের শেষ অনুজ্ঞাও প্রেম, সর্ব্বভূতে প্রেম। শক্তির সাহায্যে অশুভের সহিত সংগ্রাম টলষ্টয়ের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। শক্তির সাহায্যে অশুভকারীর প্রতি শাস্তি বিধান টলষ্টয়ের ধর্ম্মে স্থান পাইতে পারে না। তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, প্রেমের জয়। তাঁহার সাধনা, অশুভের বিরুদ্ধে শক্তি-প্রয়োগ-পরিহার (The Law of love and its Corollary the Law of Non-resistance)। মানবের সকল আচরণের সেই এক মাপ-কাটি—নিজে যেরূপ আচরণ অপরের কাছে পাইতে চাও, অপরের প্রতিও সেই আচরণ তোমার কর্ত্তব্য। মনে কর, তোমার সম্মুখে এক দস্যু আসিয়া অসহায় এক শিশুকে হত্যা করিতে উদ্যত। দস্যুকে বধ করিয়া শিশুটীকে রক্ষা করিতে তুমি সক্ষম। আর দস্যুকে হত্যা না করিলে শিশুটার প্রাণরক্ষা অসম্ভব। তখন তোমার কর্ত্তব্য কি? টলষ্টয় বলেন যে তখনও দস্যুহত্যা তোমার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। তোমার স্কন্ধে একটা পর্ব্বত বহন করা তোমার দৈহিক জীবনের পক্ষে যেমন অসম্ভব, বলপ্রয়োগও তোমার নৈতিক জীবনের পক্ষে তেমনই অসম্ভব। যাহা তোমার নৈতিক জীবনের জন্য অসম্ভব (morally imposible) তাহা তুমি করিতে পার না। অসহায় শিশুটাকে বাঁচাইবার জন্য কোনও পর্ব্বত তোমার স্কন্ধে বহন করিবার কথা ত তোমার মনে আসে না। তবে দস্যুর প্রতি বলপ্রয়োগ তোমার মনে আসিতে দেও কেন? যুক্তিতর্ক দ্বারা অসৎ মিথ্যার সহিত আপোষ করিয়া বলপ্রয়োগ তুমি করিতে পার না। দস্যুকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে পার। দস্যু ও শিশুর মধ্যে পড়িয়া তুমি প্রাণ হারাইতে পার। কিন্তু একটা কাজ তোমার জন্য সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ—তাহা ঐ দস্যুর প্রতি বলপ্রয়োগ। সেইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সহকারিত্ব বর্জ্জনের পথ বল-বিবর্জ্জিত হওয়া চাই-ই চাই। এখানেও যুক্তিতর্ক দ্বারা অসৎ, অশুভ, মিথ্যার সহিত আপোষ করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি টলষ্টয়ের মতে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র অশুভ, পাপ। তাহার সহিত আপোষ অসম্ভব।

সুতরাং তাহার সহকারিতা অসম্ভব। বৈষম্য-পোষক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভা, শিক্ষালয়, ভজনালয়, বিচারালয়, সেনা-নিবাস, কারবারের স্থান, কামান বন্দুকের কারখানা, ছাপাখানা ইত্যাদি সব হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কি করিতে পারিবে না তাহার ক্ষুদ্র এক তালিকা পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। সে তালিকা সম্পূর্ণ নয়। টলষ্টয়ের অরাজক সমাজে উপনীত হইবার প্রধান আয়োজন সংযম, চিত্তশুদ্ধি, স্বার্থত্যাগ। দৈনিক জীবনে মাদক দ্রব্য, তামাক পর্য্যন্ত, সেবন করিতে পারিবে না। আহারের জন্য জীবহিংসার প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। কামাদি রিপুর সেবা ত নিষিদ্ধই। মোটা খাইবে, মোটা পরিবে। আর মাঝে মাঝে উপবাস। উপবাস ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি ও সংযমঅভ্যাস অসম্ভব। অন্নসংস্থানের জন্য প্রত্যেকে ভূমি কর্ষণ করিয়া কিছু আহারের সামগ্রী উৎপন্ন করিবে। পরিধানের জন্য কিছু বস্ত্র-বয়ন নিজহাতে করিবে। শুধু যে দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য দৈহিক শ্রম প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। তাহার জন্য ব্যায়ামই যথেষ্ট হইতে পারিত। তোমার শারীরিক শ্রমদ্বারা আহার্য্য সামগ্রী উৎপন্ন করা (Bread labour) তোমার কর্ত্তব্য। তোমার সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য প্রথম মন্ত্র—প্রেম ও সাম্য। নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রতম সেবক যে তাহাদের ভাই, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে ভূমি কর্ষণ করিতে দিবে। নিজের জুতা ত তাহারা নিজে পরিষ্কার করিবেই, মলমূত্র আবর্জ্জনা নিজ হাতে পরিষ্কার করিতে তাহাদিগকে শিখাইবে। তবে তাহারা সত্য সত্যই বুঝিতে পারিবে যে ভগবানের রাজ্যে প্রভু ভৃত্য নাই, সেখানে সব ভাই ভাই। খাওয়া পরা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে বালক বালিকাদিগকে বিলাসভোগ পরিহার করিতে শিখাইবে। তাহাদিগের ভাইকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করিলে বিলাস সামগ্রী উৎপন্ন হয় না ইহা বুঝিলে তাহারা আপনা আপনি বিলাসভোগ পরিহার করিবে। কি করিবে না তাহা যেমন এক কথায় টলষ্টয় বলিয়া দিলেন, অরাজক সমাজে উপনীত হইবার জন্য কি করিবে তাহাও এক কথায় বলা হইয়াছে। করিবে না—শক্তিমূলক বৈষম্য-বর্দ্ধক রাষ্ট্রের কোনও প্রকারে সহকারিত্ব। আর করিবে—ভগবানে ও বিশ্বমানবে প্রীতি। শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে জাতি-বর্ণ-দেশ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে ভাল বাসিবে ঠিক যেমন নিজেকে ভালবাস। অভাবপক্ষে তোমার কর্ত্তব্য সহকারিত্ব বর্জ্জন। ভাবপক্ষে তোমার কর্ত্তব্য ভগবানে ও বিশ্বমানবে প্রীতি। এই প্রীতি সাধনের পথে অগ্রসর হইয়া তোমাকে সংযত-বাক্ ও বিরুদ্ধমত-সহিষ্ণু হইতে হইবে। তবে নিরুপদ্রবে শান্তির সহিত অরাজক সমাজে উপনীত হইতে পারিবে। বিরুদ্ধ-মত সহিষ্ণু হইবে, কিন্তু তোমার নিজের আচরণ সর্ব্বদা সত্য থাকিবে। শক্তিমূলক রাষ্ট্র পাপ, তাহার সহিত সহকারিত্ব অসম্ভব। কিন্তু সহকারিত্ব বর্জ্জন করিলে রাষ্ট্রশক্তি এখন তোমাকে নির্য্যাতন করিবে, তোমার কর্ত্তব্য তখন প্রীতির সহিত তাহা সহ্য করা। রাষ্ট্রশক্তি তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তোমাকে শাস্তি দিতে পারিবে না, কারণ সম্পত্তি ত তুমি নিজে হইতে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিবে। সুবিচারের দোহাই দিয়া রাষ্ট্র-শক্তি যখন তোমার দৈহিক স্বাধীনতা হরণ করিতে চাহিবে, তোমার কর্ত্তব্য তখন হাসিমুখে স্বাধীনতার হরণকারীর প্রতি প্রীতিদান ও রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ফলে তোমার দৈহিক স্বাধীনতা বিসর্জ্জন। ব্যবহারজীবির সাহায্যে বা অন্য উপায়ে আত্মরক্ষা করিবে না। বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড হইলে,

তোমার কর্ত্তব্য বিচারক, পুলিস, কারারক্ষক সকলকে প্রীতিদান ও হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন। প্রেম ও সহিষ্ণুতা এ উভয়ই তোমার কর্ত্তব্য। এই রূপ প্রীতির সহিত রাষ্ট্রের শাসন ও দণ্ড সহ্য করিলে রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল হইবে। তোমার অপরাজিত প্রীতিতে রাষ্ট্রের বল পরাজিত হইবে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির নিকট বল বা শক্তি (force) হার মানিবে। আর সাধারণ লোক যাহারা দোমনা ছিল তাহারা আসিয়া সহকারিত্ব বর্জ্জন ও প্রীতির পথ অবলম্বন করিবে। একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। শুধু সহিষ্ণুতায় জগাই মাধাই উদ্ধার হয় না। যেমন সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তেমনই অপরাজেয় প্রীতির প্রয়োজন। প্রীতিশূন্য, বিদ্বেষপূর্ণ দৃঢ়তার সহিত নির্য্যাতন সহ্য করিলে সহকারিত্ব বর্জ্জনে জয় লাভের সম্ভাবনা কম। সহগুণ ত যুদ্ধে শত্রু নিপাতে বদ্ধপরিকর সৈন্যেরও আছে। তাহার সহগুণে জগাই মাধাই উদ্ধার হয় না। বিদ্বেষের প্রতিদান বিদ্বেষই হইয়া থাকে। শুধু কেবল তোমার প্রীতির প্রতিদানে শুভ পাইবে। প্রীতির অভাবেই পৃথিবীতে রাষ্ট্র, পৃথক্ সম্পত্তি প্রভৃতি পাপের উৎপত্তি। প্রীতির অভাবে আধুনিক সভ্যতার যত অশুভ, যত পাপ আসিয়া জুটিয়াছে। টল্‌ষ্টয়ের মতে আধুনিক সভ্যতা শয়তানের লীলা। ধর্ম্মসঙ্ঘ (church), জাতীয়তা (nationalism) স্বদেশানুরাগ (Rationalism), শ্রমবিভাগ (division of labour), কল-কারখানা, রেল-জাহাজ, চিকিৎসাবিদ্যা, মুদ্রাযন্ত্র, শিল্প (art), সাহিত্যানুরাগ, নরনারীর তুল্যাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্দোলন (Feminism), সমাজতন্ত্রবাদ (socialism)—এ সকলই সুকৌশলে বিন্যস্ত শয়তানী ফাঁদ। এক কথায় বলিতে গেলে, আধুনিক সভ্য সমাজে নরক গুলজার। ভগবানে ও বিশ্বমানবে অজেয় প্রীতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রের সহকারিত্ব বর্জ্জন কর। এ পৃথিবীতে স্বারাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

রুশদেশে তখন ১৪ কোটী লোকের মধ্যে ১২ কোটী ছিল কৃষিজীবী। টল্‌ষ্টয় বলিতেন যে এই রুশ দেশীয় কৃষিজীবিগণ ধর্ম্ম-প্রাণ। তাহাদের সহিত একত্র ভূমি কর্ষণ করিয়া, একত্র বাস করিয়া, তাহাদের বিরোধ আপোষে মিটাইয়া টল্‌ষ্টয়ের ধারণা হইয়াছিল যে এই ধর্ম্ম-প্রাণ শ্লাভ্‌জাতীয় (slav) কৃষকদলই ভূসম্পত্তিরূপ বিশ্বব্যাপী মহাপাপের ক্ষয় করিবে। এই মহাপাপের নাশ হইলে শক্তিমূলক শাসনরূপ পাপও দূর হইবে। আর য়ুরোপের যত দেশ বা জাতি আছে তাহার মধ্যে রুশ দেশীয় কৃষকগণই এই পাপ নিরাকরণে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম।

(১৬)

স্বারাজ্য সংস্থাপনের এই নূতন পথে চলিতে যদি রুষ দেশের সব লোক সত্য সত্যই চেষ্টা করিত তবে তাহাকে ব্যাধিতের স্বপ্নের ন্যায় নিরর্থক বলা সাজিত না। কিন্তু শুধু রুশদেশের সকলে এই নূতন পথে চলিয়া স্বারাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াস পাইলে সে প্রয়াস সফল হইত না। রুষ দেশের বাহিরেও মানুষ আছে আর এই বাষ্পশক্তি ও তড়িৎশক্তির যুগে তাহাদের সহিত রুশ দেশবাসীর কোনও সম্পর্ক নাই এরূপ বলা চলে না। রুষ দেশের বাহিরের লোকেরাও এই নূতন পথে চলিতে সত্য সত্য চেষ্টা করিলে তবে রুষদেশে নিরুপদ্রবে

স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু পৃথিবীর বার আনা লোককে এক মত করিয়া এই টলষ্টয়প্রদর্শিত প্রীতি ও সহকারিত্ব-বর্জ্জনের পথে চলিতে সম্মত করা কবির কল্পনা মাত্র। তাহা বাস্তব জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কার্য্যতঃ রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া রুষদেশীয় ধর্ম্মপ্রাণ কৃষকগণ টলষ্টয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিল ও ভ্রাতৃহত্যার জন্য কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সহকারিত্ব-বর্জ্জনবাদ প্রচারিত হইবার পরে তাহারা ১৯০৪ সালে এক বার ও ১৯১৪ সালে আর এক বার বিশ্বমানবে অজেয় প্রীতির মহামন্ত্র ভুলিয়া গিয়া নরশোণিতে ধরাতল রঞ্জিত করিয়াছে। ১৯০৪ সালে টলষ্টয় তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ভ্রাতৃহত্যা মহাপাপ। জাপানের লোকের সহিত যুদ্ধ করিও না। ঈশ্বরের আদেশ নরহত্যা করিবে না। নরহত্যাকে যুদ্ধ নাম দিলেও তাহা মহাপাতকই থাকে, তাহা পুণ্য হইতে পারে না। টলষ্টয়ের সম্মানার্হ ধর্ম্মপ্রাণ কৃষকগণ কিন্তু টলষ্টয়ের কথায় কাণ দিল না। তাহারা রাষ্ট্রশক্তির নিকট হার মানিল। বর্ব্বর-সুলভ শিকার-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তাহারা মাতিয়া উঠিল।

রুশ দেশের বাহিরেই মানুষ-শিকার চলিতে লাগিল, এরূপ নহে। সহকারিত্ব বর্জ্জন-বাদ প্রচারের পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনই সম্রাটের শাসন দণ্ড ভীষণ প্রতাপ দেখাইতে লাগিল। সহস্র সহস্র লোকের দণ্ড হইতে লাগিল—কাহারও বা প্রাণ দণ্ড, কাহারও বা কারাবাস, কাহারও বা নির্ব্বাসন। যে কারণেই হউক, বৃদ্ধ টলষ্টয়ের প্রতি দণ্ডবিধান রাজপুরুষদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু শক্তিবাদী বিপ্লবপন্থিদের (revolutionaries) ত কথাই নাই, সংস্কারপন্থিগণও (gradualists) সম্রাটের শাসনদণ্ডের প্রবল প্রতাপ বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। দলে দলে সমাজ-তন্ত্র-বাদী (socialists) নির্ব্বাসিত হইতে লাগিলেন। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কিছুটা সহকারীত্ব-বর্জ্জন অনেকেই করিলেন। স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা—ইহার অভাব হইল না। সুখস্বার্থ বিসর্জ্জন ত সহজ কথা, প্রাণ বিসর্জ্জনেও অনেকে ইতস্ততঃ করিলেন না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে টলষ্টয়ের প্রচারিত শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে অজেয় প্রীতির পরিচয় বড় একটা পাওয়া গেল না। সম্রাট্ ও রাজপুরুষদিগের মধ্যে ত নয়ই, স্বাধীনতা-প্রয়াসী বিপক্ষ দলেও নয়। সংস্কার-পন্থী, বিপ্লব-পন্থী, সমাজ-তন্ত্র-বাদী (socialist) গণ-তন্ত্রবাদী, সমাজ-তন্ত্র-গণতন্ত্রবাদী (social democrat), ভদ্রলোক, শ্রমজীবী কৃষিজীবী কেহই প্রীতিমন্ত্র ধারণ করিতে সত্য প্রয়াস করিল না। সুতরাং বল বা শক্তির লীলা উভয় পক্ষে চলিতে লাগিল। জগাই মাধাই উদ্ধার আর হইল না।

১৯১৪ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বেই সহকারিত্ব-বর্জ্জন-বাদ রুশীয় জনগণকে বিশ্বমানবের প্রীতির সাধনে নিযুক্ত করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আর এক কাজ অনেকটা করিয়া গিয়াছিল। রাষ্ট্রের, শুধু রাষ্ট্রের কেন, বহুমানবের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগমাত্রের (organisations) ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিল। গড়িবার কাজ করিতে পারে নাই, কিন্তু ভাঙ্গিবার ব্যবস্থাটা দিয়াছিল। বাঁধন জমাট করিতে পারে নাই কিন্তু বাঁধন আলগা করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

"ভারতের স্বর্গভূমি" বা "মানবজাতির স্বর্গভূমি"।

(ঐতিহাসিক তত্ত্ব)

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়া অনেকেই হয়ত মনে করিতেছেন, যে আমি কাশ্মীরের প্রসঙ্গের অবতারণাই এখানে করিব। কারণ কাশ্মীরই সকলের নিকট ভারতে "ভূস্বর্গ" বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আমার লক্ষ্য কাশ্মীর নহে, আমার লক্ষ্য আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গদেশ। ইহাতেও অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন যে, স্বদেশকে "স্বর্গ" বলিয়া বর্ণনা ইহা মানব-মাত্রেরই প্রকৃতিগত, তবে বঙ্গদেশকে "স্বর্গ" বলিয়া বর্ণনা করায় গতানুগতিকতাই মাত্র হইবে, ইহাতে অধিক বৈশিষ্ট্য আর কি হইবে? আমরা এরূপ কোন ভাবাবেগের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এস্থলে প্রবন্ধের সূচনা করি নাই, পরন্তু আমাদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে অতীব গৌরবময় নিরপেক্ষ প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতেই উপস্থিত প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছি।

সুদূর অতীতকালেই বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত প্রাচীন রাজধানী গৌড় খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই যে পরম সৌষ্ঠবশালী নগরীরূপে পরিণত হইয়াছিল—ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরেই তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করে। ইহা বৈভবে ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীরই তুল্যস্পর্দ্ধী হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের উক্তি এই :—

"Historic Gour, which was it is computed a magnificent city five or six centuries before Christ. Gour was to Bengal what Delhi was to Hindusthan." History of the Portuguese in Bengal p 19 by J. J A wampos

বঙ্গদেশের পণ্যসম্ভার যে পুরাকালেই বিদেশে অপূর্ব্ব উপাদেয় দ্রব্যরূপে সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাও ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রোমক মহিলাগণ বঙ্গদেশের মথ্‌মল্‌ কাপড় পরিধান করিয়াই আপনাদের পরিচ্ছদের পারিপাট্য সাধন করিতেন। কেবল তাহাই নহে বঙ্গদেশের মসলা দ্রব্য ও অপর পণ্য বস্তুও, রোমকদিগের দ্বারা বিশেষরূপে সমাদৃত হইত ও অসম্ভব উচ্চমূল্যে ক্রীত হইত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের নিজের সাক্ষ্যই এখানে উদ্ধৃত হইতেছে :—

'There were times when the muslins of Dacca shipped from Satgaon clad the Roman ladies and when spices and other goods of Bengal that used to find their way to Rome through Egypt were very much appreciated and fetched fabulous prices." Ibid p. 22

রোমকেরা পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতাগুরু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই রোমকেরা যে সমস্ত বস্তু মনোরম ও মূল্যবান্‌ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন তৎসমস্ত যে পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা সহজেই অনুধাবনা করা যায়।

রোমকেরা যেরূপ বঙ্গদেশের বাণিজ্যদ্রব্যজাত অপূর্ব্ব ও অমূল্য বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহাতে পরবর্ত্তী পর্টুগীজ বনিকগণমধ্যেও যে অনুরূপ ধারণারই পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা

কিছুই বিচিত্র নহে। পর্টুগীজদিগের উল্লিখিত ধারণা সম্বন্ধে তাহাদিগের ইতিহাস লেখক লিখিতেছেন :—

"Regarding the trade and wealth of Bengal, the Portuguese had the most sanguine expectation which did not indeed, prove to be far from true" Ibid p, 25.

"বঙ্গদেশের বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে পর্টুগীজগণ অতিমাত্রায় উৎসাহপূর্ণ প্রত্যাশা পোষণ করিতেন, এই প্রত্যাশা বস্তুতঃ সুদূরপরাহত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই"।

স্বনামধন্য পর্টুগীজ নাবিক্ ভাস্কোডিগামা পর্টুগীজরাজ সমীপে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রদান করেন, তাহাতে বঙ্গদেশের অতুল বাণিজ্য বিভবের উল্লেখই পাওয়া যায়।

"The country could export quantities of wheat and very valuable cotton goods Cloths which sell on the spot for twenty-two shillings and six pence fetch ninenty shillings at Calicut It abounds in silver." Ibid p, 25.

"এই দেশ প্রভূত পরিমাণে গম ও অতীব মূল্যবান্ কার্পাসজাত পণ্যদ্রব্যসকল রপ্তানি করিতে সমর্থ। যে সমস্ত বস্ত্র এইস্থানে বাইশ শিলিং ছয় পেন্সে বিক্রীত হয় কালিকাটে এ সমস্তেরই নব্বই শিলিং মূল্য পাওয়া যায়। এইদেশে প্রচুর রোপ্য পাওয়া যায়।"

পর্টুগীজদগের অন্যতম প্রধানাধ্যক্ষ আল্‌বুকার্ক পর্টুগালের রাজার নিকট যে সমস্ত পত্রাদি প্রেরণ করিতেন তৎসমস্তেও বঙ্গদেশের অপার ঐশ্বর্য্যের কথা উল্লেখ থাকিত :—

"From time to time Albuquesque had witten to King Manoel about the vast possibilities of trade and commerce in Bengal." Ibid p, 25.

"সময় সময় আল্‌বুকার্ক বঙ্গদেশের ব্যবসায়বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনার বিষয় রাজা মেনোয়েলের নিকট লিখিয়া জানাইতেন।"

বৈদেশিকদিগের উপরিউক্ত বিবরণ সকল হইতে বঙ্গদেশ যে কি জন্য অপূর্ব্বদেশ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

কেবল বৈদেশিকের নিকটেই বঙ্গদেশ অপূর্ব্ব দেশ রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু ভারতবাসীর নিকটও যে বঙ্গদেশ অপূর্ব্বদেশ রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণই বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতীয় অশেষ ঐশ্বর্য্যশালী মোগলসম্রাটগণ যে বঙ্গদেশকে অপূর্ব্ব দেশেরও অধিক"স্বর্গ-ভূমি" বলিয়াই মনে করিতেন তাহার অকাট্য ঐতিহাসিক নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গদেশ স্পষ্টক্ষরেই "ভারতের স্বর্গভূমি" "মানবজাতির স্বর্গভূমি" বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা সেই প্রমাণটী উদ্ধৃতকরা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি :—

"A memoir by monsieur Jean Law, chief of French factory at Cossimbazar says :—In all official papers, firmans, parwanas of Moghal Empire, when there is question of Bengal, it is never named without adding "Paradise of India," an epithet given to it par excellence" Cf. Hill's Bengal in 1856-57, vol. iii. p., 160. Aurangzeb is said to have styled Bengal "the Paradise of nations." Ibid p, 19.

"কাশিমবাজারের ফরাসী কারখানার অধ্যক্ষ জিন্ ল কর্ত্তৃক লিখিত স্মৃতিলিপিতে উক্ত হইয়াছে—"মোগল্ সাম্রাজ্যের সরকারী সকল কাগজপত্রে, ফার্ম্মানে ও পরওয়ানায় যখনই

বঙ্গদেশের প্রসঙ্গ উপস্থিত দেখা যায়, তখনই "ভারতের স্বর্গ" এই কয়টী কথা ইহার সহিত সংযুক্ত না করিয়া কখনও ইহার উল্লেখ করা হয় না। এই সংজ্ঞাটী ইহার বিশেষ উৎকর্ষ স্থাপনার্থই এতৎপ্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে"।

"ইহা কথিত আছে যে আরঙ্গজেব বঙ্গদেশকে "মানবজাতির স্বর্গ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।"

বঙ্গদেশের এই "স্বর্গ" আখ্যা যে অযথা প্রযুক্ত হয় নাই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও তাহা অকুণ্ঠিতভাবেই স্বীকার করিয়াছেন :—

"When the Portuguese actually established commercial relations in Bengal, they realized to their satisfaction what a mine of wealth they had found. Very appropriately indeed, did the Mughals style Bengal, "the Paradise of India." Ibid 25

"যখন পর্টুগীজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিলেন তখন তাঁহারা যে কি সম্পদের আকর প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া প্রীত হইলেন। মোগলেরা যথার্থই বিশেষ সুসঙ্গত রূপেই বঙ্গদেশকে "ভারতের স্বর্গ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন।

এস্থলে এই নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্বই আমাদের নিকট সুপরিস্ফুট হইতেছে যে বঙ্গদেশের "স্বর্গভূমি" আখ্যা বঙ্গবাসীদিগের দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই। পরন্তু ইহা ভারতের একচ্ছত্র মোগল সম্রাটদিগের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছিল। যে মোগল সম্রাট্‌গণ আপনাদিগকে "দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরোবা" বলিয়া পরমেশ্বরের সমকক্ষতাস্পর্দ্ধী হইয়াছিলেন, যাহারা পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের অন্যতম তাজমহল ও অনুরূপ প্রাসাদাবলী নির্ম্মাণ করত দিল্লীকে দ্বিতীয় ইন্দ্রপ্রস্থ বা ইন্দ্রপুরীতে পরিণত করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গদেশকে "স্বর্গভূমি" অভিধা প্রদান করিবেন এবং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও তাহা অম্লানবদনে অনুমোদন করিবেন ইহা বঙ্গদেশের কম আস্পর্দ্ধার বিষয় নহে। ইহাতে বঙ্গদেশের অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা কেবল সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নহে— ইহা অপূর্ব্ব মহিমাও ধারণ করিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য কবিও যে ইহাতে কিরূপ নন্দনকাননেরই শোভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী হইতেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে :—

"Here by the months, where hallowed Ganges ends, Bengal's beauteous Eden wide extends." Lusiadas, canto vii, Stanza xx, by Camoes. Mickle's Trans quoted in the History of the Portuguese in Bengal' by J. J. A. Campos-front page

এইরূপে যখন আমরা আমাদের স্বদেশকে আজ রূপক স্বর্গ মাত্র না বুঝিয়া একরূপ স্বর্গ বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি, তখন ইহাতে আমাদের মধ্যে স্বদেশ ভক্তির অভিনব অনুপ্রাণনা আসিবে বলিয়া আশাকরা কি একান্তই দুরাশা হইবে?*

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

---

* J. J. A Campos প্রণীত সম্প্রতি প্রকাশিত সুলিখিত "History of the Portuguese" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের "Bengal, The Paradise of India" শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ের মর্ম্মগ্রহণে প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। লেখক।

উপাধি রহস্য

দ্বিতীয় প্রস্তাব

প্রাচীন ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পরে জাতিগুলি যখন জন্মগত হইয়া দাঁড়াইল, উক্তযুগে পূর্ব্বযুগের রীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তদানীন্তন সামাজিকগণ এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নাম বা উপাধি ব্যক্ত করিলেই তিনি কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তাহা বুঝা যাইবে। তাই মহর্ষি শঙ্খ বলিতেছেন :—

মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনস যুক্তং শূদ্রস্য জুগুপ্সিতং ।

৩।২ অ

বংশগত উপাধি

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নাম মাঙ্গল্য সূচক ক্ষত্রিয়ের বলসংযুক্ত, বৈশ্যের ধনসংযুক্ত এবং শূদ্রের "দাস' বা নিন্দিত শব্দসংসূচক রাখা উচিত। এই সকল ব্যক্তিগত সংজ্ঞা হইতেই বংশগত উপাধির প্রচলন হইয়াছিল। আমরা উদাহরণ দ্বারা আমাদের এই উক্তিটি স্পষ্টীকৃত করিব। যেমন লোকমান্য পূজ্যপাদ ৺ বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক। এখানে "বলবন্তরাও" কথাটি ভারতপূজ্য মহাত্মা তিলকের নিজ নাম এবং গঙ্গাধর তাহার পিতৃদেবের ব্যক্তিগত সংজ্ঞা আর "তিলক" কথাটি তাঁহাদিগের আদিবংশ প্রবর্ত্তয়িতার ব্যক্তিগত সংজ্ঞা। ঐরূপ হরিপদ "বল" বা "ত্রাতা", রামহরি "বসু" বা "দত্ত" ইত্যাদি কথিত হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে 'হরিপদ' ও 'রামহরি' প্রভৃতি সংজ্ঞা উহাদিগের christian name এবং "বল" বা "ত্রাতা" এবং "বসু" ও "দত্ত" শব্দগুলি যথাক্রমে তাঁহাদিগের Surname। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে "বলবন্তরাও তিলক"নামা কোন ব্যক্তির এবং "হরিপদ" ও "রামহরি" যথাক্রমে "বল" বা "ত্রাতা" এবং "বসু" বা "দত্ত" নামা ব্যক্তি বিশেষের অধঃস্তন সন্তান। এইরূপ বীজী পুরুষের নামানুসারে উপাধির প্রচলন হইলে পর তৎপরবর্ত্তী যুগের সমাজতত্ত্ববিদগণ দেখিলেন যে পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য সমাজের পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে; তজ্জন্য তাঁহারা এই রীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া এই নিয়ম প্রচলন করেন যে, ব্রাহ্মণের নামান্তে "শর্ম্মা" বা "দেব", ক্ষত্রিয়ের নামান্তে "বর্ম্মা" বা "ত্রাতা" বৈশ্যের ও শূদ্রের নামান্তে যথাক্রমে "ধনবাচক ও দাস" শব্দ ব্যবহার বিধেয়। তাই যমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে

শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতি দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাস শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥

বর্ত্তমান ভৃগুোক্ত মনুসংহিতায়ও দেখিতে পাই

শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্যস্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্।

ব্রাহ্মণের শর্ম্মার্থ অর্থাৎ শর্ম্মা বা দেব, ক্ষত্রিয়ের রক্ষার্থ (বর্ম্মা বা ত্রাতা), বৈশ্যের পুষ্টার্থ (বসু, ভূতি, দত্ত) শূদ্রের পৈষ্যার্থ অর্থাৎ নিন্দিত দাস শব্দ ব্যবহার করাই বিধিসঙ্গত। বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রবাক্য অনুমোদিত উপাধিগুলি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরাজমান—ব্রাহ্মণার্থ প্রতিপাদক "দেব" শব্দ তথাকথিত শূদ্রজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্ষত্রিয়ার্থ প্রতিপাদক "বল" "পাল" "পালিত" "সূর" "সিংহ" চন্দ্র ইত্যাদি এবং বৈশ্য শোণিত সম্পর্ক বিঘোষী 'বসু" "দত্ত" "নন্দি" প্রভৃতি উপাধিগুলিও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের (বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে) তথাকথিত শূদ্রজাতির মধ্যেই বহুলপরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। সুদূর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বসবাস নিবন্ধন ও ভারতের বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করত ভিন্ন ভিন্ন সমাজের লোকের সম্পর্কে আসিয়া আমরা ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে সমগ্র হিন্দুস্থানে বিশেষতঃ পাঞ্জাব, মথুরা, গয়া, বারানসী, উৎকল এবং বাঙ্গলা (১) ও বিকানীর প্রভৃতি দেশে ক্ষত্রিয়োচিত "চন্দ্র" "সিংহ"

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ।
আত্রেয়ো রথশর্ম্মা চ নন্দশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ।
কৌশিকো দাসশর্ম্মা চ পতিশর্ম্মা চ মুদ্গলঃ।

—সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ

প্রভৃতি উপাধিধারী ও বৈশ্যোচিত উপাধিবিশিষ্ট "দত্ত, সেন, গুপৎ (গুপ্ত), ধর, কর, নন্দী বহু ব্রাহ্মণের বসবাস রহিয়াছে। শাস্ত্রবাক্যশাসিত হিন্দুসমাজে এইরূপ উপাধিগত বৈষম্য ঘটিবার কারণ আমরা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ পূর্ব্বকালে অনুলোম বিবাহজাত সন্তানগণ পিতৃস্বজাত্য ভজনা করিতেন এবং তাঁহাদিগের উপাধি পিতৃসদৃশ হইত। সুতরাং অনুলোমজের উপাধি তত্তৎ পিতৃবর্ণানুযায়ী হইত বটে কিন্তু মুখ্য ও গৌণ ভেদে কিছু তারতম্য ছিল (২)। তাই ব্রাহ্মণ হইতে অনুলোমক্রমেজাত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান ও মুখ্য ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীতে জাত ব্রাহ্মণ) এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য এই রীতি প্রচলন করেন যে দ্বিবর্ণসম্ভূত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ মাতৃ ও পিতৃকুলের উভয়বিধ উপাধি ব্যবহার করিবেন। এ কারণ আমরা বর্ত্তমান সময়েও দ্বিবর্ণ উপাধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সত্তা দেখিতে পাই। বাঙ্গলার বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের করশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা, নন্দিশর্ম্মা, পতিশর্ম্মা, পাঞ্জাব, মথুরা, গয়া, কাশী, বিকানীর ও উৎকল প্রভৃতি স্থানের দত্তশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, সিংহশর্ম্মা, গুপৎশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা, করশর্ম্মা, চন্দ্রশর্ম্মা ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। এইরূপ দ্বৈধীভাবাপন্ন উপাধি দেখিয়া মনে হয় যে উঁহারা সকলেই দ্বিবর্ণসম্ভূত তজ্জন্যই তাঁহাদিগের নামান্তে মাতৃকুলের ক্ষত্রিয়োচিত "চন্দ্র ও সিংহ" এবং বৈশ্যোচিত "দত্ত, ধর, কর" ইত্যাদি এবং পিতৃকুলের "শর্ম্মা" শব্দটি উপাধিস্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন।

প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজে মুখ্য ও গৌণভেদে পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য যে রীতি প্রচলন হইয়াছিল ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় সমাজেও ঠিক সেই রীতি গৃহীত না হইলেও, বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় জাতির সাধারণ—"ধর্ম্ম, ত্রাতা, রাণা, রাও, সিংহ, খান্না, কপূর, টন্নন, মেহেরা, নেহেরা, তাড়োয়ার, মল,

---

(১) বাঙ্গলার বৈদিকব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধর, কর, রূপ, নন্দি, পতি প্রভৃতি উপাধি বর্ত্তমান।

(২) মৎরচিত "অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি ও প্রসার" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ৩৬৮ পৃঃ

ধাওয়ান" প্রভৃতি—বলসংযুক্ত ক্ষত্রিয়ার্থ প্রতিপাদক পদগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে, মুখ্য ক্ষত্রিয়গণ ঐ সকল উপাধি ধারণ করিতেন এবং গৌণ ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ও উগ্রগণ পাল, পালিত ইত্যাদি ক্ষত্রিয় শোণিতসম্পর্ক বিযোবী শব্দদ্বারা আপনাদের পার্থক্য সংসূচিত করিতেন। কেন আমরা এরূপ অনুমান করিতে অভিলাষী? কারণ বর্ত্তমান সময়ে ভারতে কোন স্থানে (অবশ্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি সন্ধান লইয়া যত দূর জানিতে পারিয়াছে) "পাল বা পালিত" প্রভৃতি (৩) উপাধিবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়জাতির সত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক প্রাচীন বৈশ্যসমাজে মুখ্য ও গৌণ্যভেদে ঠিক এইরূপ রীতি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা আমাদের এই যুক্তির সারবত্তা সপ্রমাণ করিব। যদি হরেকৃষ্ণ "বসু বা দত্ত" এরূপ কথিত হয় তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত বাক্যানুসারে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে হরেকৃষ্ণ "বসু বা দত্ত" মুখ্য বৈশ্যও হইতে পারেন অথবা গৌণ বৈশ্য করণ (৪) এই উভয়বিধ জাতি হইতে পারেন। কারণ ধনসংযুক্ত "বসু বা দত্ত" শব্দ উভয়বিধ জাতিতেই প্রযোজ্য। এইরূপ শব্দবিপর্য্যয়ে জাতিগত পার্থক্য ঠিক সংসূচিত হইতেছে না দেখিয়া পরবর্ত্তীদিগের সমাজতত্ত্ববিদগণ এই রীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া এই নিয়ম করেন যে মুখ্য বৈশ্যগণই নামান্তে "গুপ্ত" শব্দ (৫) ব্যবহার করিবেন।

একারণ এখনও আমরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ বনিকজাতির মধ্যে "গুপ্ত" উপাধিটি সীমাবদ্ধ দেখিতে পাই। দ্বিতীয় কারণ—প্রতিলোম বিবাহ (৬)। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এই প্রতিলোম বিবাহকে নিকৃষ্ট বিবাহ এবং ঐ সকল প্রতিলোমজাত সন্তানগণকে শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াও প্রখ্যাপিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রতিলোমজগণও গুণ ও কর্ম্মানুসারে উচ্চবর্ণে উন্নীত হইতেন, শাস্ত্রে ইহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই (৭)। সুতরাং পরবর্ত্তী যুগে তাহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচিত উপাধি ধারণ করিয়াছেন, ইহাও আমরা অনুমান করিতে পারি। আরও একটি কথা, প্রতিলোমজগণ শূদ্রধর্ম্মা হইলেও পিতৃকুলের উপাধিতে পরিচিত হইতেন। যেমন একালের মহাত্মা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজ ও মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠাপিত আর্য্যসমাজের কোন "সিংহ ও দত্ত" উপাধিধারী ক্ষত্রিয়

---

(৩) তবে পরবর্ত্তীযুগে ইহাও দেখিতে পাই যে "পালিত" আদি ক্ষত্রিয়শোণিত বিরোধী শব্দ বৈশ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাজন্য বিশো বা এই সূত্রের টীকায় মহামহোপাধ্যায় বৈদ্যকুলতিলক শ্রীপতি দত্ত তাঁহার কলাপ পরিশিষ্ট ৯০ পৃষ্ঠায় 'পালিত' আদি শব্দগুলিকে বৈশ্যোচিত উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

(৪) "শূদ্রাবিশোস্তু করণ" অমরকোষ।

(৫) "গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ। বৈশ্যগণ ব্যবসাবাণিজ্যদ্বারা সমাজ রক্ষা করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের উপাধি 'গুপ্ত।"

(৬) প্রতিলোম বিবাহের বিষয় বারান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

(৭) শুক্রকন্যা দেবযানীর গর্ভে ও যযাতির ঔরসে যদুর জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণ যদু বংশে প্রসূত। জাতিতে সূত অতএব ইঁহারা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু সেই শূদ্রযোনি শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল গুণবলে ক্ষত্রিয়কুলে আসন পাইয়াছিলেন না? এখনও কি পনর আনা হিন্দু "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেছেন না?

ও বৈশ্য সন্তান ব্রাহ্মণতনয়ার পানিগ্রহণ করিলে তদ্ গর্ভজাত সন্তান "সিংহ ও বৈশ্য উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় কারণ—হিন্দু সমাজের মধ্যে নির্গমন অর্থাৎ উচ্চবর্ণ স্বকর্ম ত্যাগজনিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ালোপ হেতু ব্রাত্যতা বা শূদ্রত্ব গ্রহণ।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন অনেকে খৃষ্টিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করায় বা অন্য কারণবশতঃ শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় Shelly Bonnerjee, হরিশ মুখোপাধ্যায় Harris Mokerjee, নরেশ পাল Noris Paul মাখন সেন Maken Saynne প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াও বংশগত উপাধির মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তেমনি আর্য্যশাসনকালে সামাজিক নিষ্পেষণে, বৌদ্ধ ও মুসলমান রাজত্ব সময়ে শূদ্রাচার অবলম্বন করায় অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যসন্তান শূদ্র হইয়া যাইলেও তাহারা তাহাদের নামান্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যোচিত উপাধি ত্যাগ করেন নাই। তাই আমরা ঐ সকল উপাধি বর্ত্তমান তথাকথিত শূদ্রজাতির মধ্যে ঐ সকল উপাধি দেখিয়াই বাঙ্গালার রঘুনন্দন তাঁহার "শূদ্রাহ্নিকাচার" তত্ত্বে ধনসংযুক্ত "বসু" আদি শব্দ শূদ্রের নামকরণ হইবে এইরূপ লিখিয়াছিলেন (৮)।

চতুর্থ কারণ—আগমন অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মানুসারে নীচবর্ণ উচ্চবর্ণে প্রবেশ লাভ করায় জাতিগত উপাধির যে কিছু বৈষম্য ঘটে নাই তাহাও আমরা বলিতে পারি না। এতৎসম্বন্ধে মৎরচিত "প্রাচীন ভারতে জাতি বিভাগের উৎপত্তি ও প্রসার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে সামাজিকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি সংমিশ্রণের ফলে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে উপাধিবিভ্রাট ঘটিয়াছে, ইহা উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমি যখন "প্রাচীনভারতে জাতিবিভাগের উৎপত্তি ও প্রসার" শীর্ষক প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মিরাট শাখায় পাঠ করি উহার আলোচনাপ্রসঙ্গে তদানীন্তন সভাপতি অশেষ-শাস্ত্রবিৎ শ্রদ্ধেয় ৺ কালীপদ বসু বি, এ মহোদয় বলিয়াছিলেন "বাপুহে। প্রাচীন ভারতে গুণ ও কর্ম্মানুসারে উচ্চবর্ণ নীচবর্ণ ও নীচবর্ণ উচ্চবর্ণ প্রাপ্ত ত হইতেনই, কিন্তু পরানুগ্রহেও অনেক নীচজাতি উচ্চজাতি হইয়াছেন তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। দেখ। স্কন্দ পুরাণে আছে :—

"অব্রাহ্মণ্যে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রযত্নতঃ।
স্বচাঙ্কং প্রবলং কণ্ঠে যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ॥
স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে স ক্ষেত্রে বিপ্রান প্রকল্পিতান।
সামদগ্ন্যস্তদোবাচ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥"

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে "পূর্ব্বকালের কথা ত ছাড়িয়া দাও বর্ত্তমান সময়েও ইহার অভাব নাই। দেখ, গত ১৮৯১ খৃঃ সেনসস্ রিপোর্টের সময় উক্তকার্য্যে আমি নিযুক্ত ছিলাম। ঐ সময়ে এই মীরাট ডিভিসনে "তগা ও ভার্গব" জাতি যাহারা পূর্ব্বে অব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন তাহারাই তাগা ব্রাহ্মণ ও ভার্গব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং তদবধি তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন এবং এখনকার ব্রাহ্মণ সমাজেও গৃহীত হইয়াছেন। দেখ! কেবল যে এই সকল দেশে এইরূপ হইয়েছে তাহা নহে অন্যান্য প্রদেশেও ইহার অভাব নাই। দেখ! রিজলী সাহেবের গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে:—

Members of other castes gaining admission into the Kayastha community some of these statements are curiously precise and specific It is said for example, that a few years ago many Magh families of Chittagong settled in the western

(৮) শূদ্রাদীনাং নামকরণে বসু ঘোষাদিকপদ্ধতিযুক্ত নাম করণঞ্চ প্রতীয়তে, বৈদিক কর্ম্মাদি শূদ্রানাং পদ্ধতিযুক্ত নামাভিধানং ক্রীয়তে।" ৫০৪ পৃঃ।

districts of Bengal assumed the designation of Kayastha and were allowed to intermarry with true Kayastha families. An extreme case is cited in which the descendants of a Tibetan missionary have somehow found their way into the caste and are now recognised as true Kayasthas.

আলোচনা প্রসঙ্গে আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত এম, এস্‌-সি মহাশয়ও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বগ্রামের (বরিশালের) কয়েকঘর বারুইজাতি কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আমরাও কোলাচল মল্লিনাথের' প্রতিদ্বন্দ্বী মহামহোপাধ্যায় ভরতসেন মল্লিক মহাশয়ের "চন্দ্রপ্রভা" পাঠে অবগত হই, যে মহারাজ বিমলসেন ভূমির রাজা ছিলেন; তাঁহার অধস্তন সন্তান নাথসেন শিখরভূমির অন্তর্গত পাহাড়খণ্ডের রাজা হয়েন। নাথসেনের পুত্র বিজয়সেন, বিজয়সেনের পুত্র রাজা চন্দ্রসেন। চন্দ্রসেনের রাজা চন্দ্রখান প্রভৃতি আঠারটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে তাঁহার অষ্টপুত্র শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়া কায়স্থ হইয়াছেন (৯)। আর কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তদীয় "রাজমালা" গ্রন্থের একস্থানে লিখিতেছেন—

"বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের আর একটি শ্রেণী, যাহারা ভদ্রলোকদিগের "সেবক" বা "ভাণ্ডারী" বলিয়া পরিচিত এবং শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। আদমসুমারির কর্তাগণ ইহাদিগকে কায়স্থ শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। ত্রিপুরা জিলায় ইহাদের সংখ্যা প্রকৃত কায়স্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। চৌদ্দ গ্রামের পাল্কীবাহক বেহারাগণও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে"।—৪৭০ পৃ.

ইহা ব্যতীত বর্তমান হিন্দুসমাজে যে কত সংমিশ্রণ-ব্যাপার নিত্য সাধিত হইতেছে ও হইয়াছে তাহাও চেতস্বান সামাজিকগণ অবগত নহেন। যাহা হউক যদি এই সকল উক্তির কোন মূল্য থাকে তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে উপাধিবিভ্রাট ঘটিবার ইহাই অন্যতম কারণ।

বংশগত উপাধির উৎপত্তি ও উহার ক্রমপরিবর্ত্তনের বিষয় আমরা যাহা যাহা বলিলাম উহা হইতেই সামাজিকগণ তথ্য নির্ণয় করিয়া লইবেন। এখানে আমরা বিদ্যাগত বৃত্তি বা কার্য্যগত উপাধির বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বিদ্যাগত উপাধি।

প্রত্যেক সভ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদ্যাগত উপাধি গুলি জাতিনির্বিশেষে ব্যক্তিবিশেষকে প্রদান করা হয়। কিন্তু ভারতীয় মধ্যযুগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যা হইতে সমাগত বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ, শিরোমণি, বাচস্পতি, আচার্য্য, কবীন্দ্র, উপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায়, তর্করত্ন, বিদ্যাবাগীশ, শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য, চৌবে বা চতুর্ব্বেদী, দোবে বা দ্বিবেদী, ত্রিবেদী প্রভৃতি উপাধিগুলি ব্রাহ্মণবর্ণ (মুখ্য ও গৌণ) ব্যতীত অন্য কোন জাতিই ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কি স্বার্থপরতা। এই পাপেই ভারত রসাতলাদপি রসাতলে গিয়াছে!! এই বিদ্যা হইতে সমাগত 'উপাধ্যায়' (বিভিন্নগ্রামে বসবাস নিবন্ধন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় হইয়াছে মাত্র। গুরবা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উপাধ্যায় উপাধিও বিরাজমান।) "আচার্য্য" মান্দ্রাজে এই আচার্য্য শব্দের অপভ্রংশে "আচারিয়া" ভট্টাচার্য্য, চৌবে, দোবে, ত্রিবেদী উপাধিগুলি কোন পূর্ব্বপুরুষ হইতে পুরুষানুক্রমে সমাগত হইয়া পরবর্ত্তীবংশে সঞ্চারিত হইয়াছে মাত্র। এই সকল অবান্তর উপাধিগুলির ব্যবহারে বংশগত উপাধিগুলি একেবারে

(৯) "চন্দ্রপ্রভার" ২১০ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। স্থানাভাববশতঃ এখানে উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

অন্তর্হিত হইয়াছে। ক্রিয়া হইতে সমাগত উপাধি বংশগত উপাধিতে পরিণত হওয়া বোধ হয় ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে হইয়াছে কিনা তাহার প্রমাণ অতীব বিরল।

বৃত্তি বা কার্য্যগত উপাধি—আর্য্যশাসনকালে শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি গ্রহণ করায় যেমন একই জাতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, তেমনি বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করায় ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বাংলার "শৌণ্ডিক" জাতির সাধারণ উপাধি সাহা, এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের "সাহাই" শব্দের প্রতি সামাজিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শৌণ্ডিকগণ জাতিতে বণিক বা সাধু তজ্জন্য উহাদিগের জাতিগত উপাধি "সাধুর" অপভ্রংশে "সাহা" বা "সা" কিম্বা "সৌ" অথবা "সাহাই" উপাধি বিরাজমান। এইরূপ আর একটি জাতি বংশপরম্পরায় লবণের ব্যবসা করিতেন বলিয়া উহাদিগের জাতিগত উপাধি "নুনিয়া" হইয়া গিয়াছে। এরূপ ব্যবসাগত উপাধি প্রচলনপ্রথা পাশ্চাত্য জগতেও বিরল নহে। উহাদিগের Smith, Blacksmith, Goldsmith প্রভৃতি উপাধি জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে॥ যাহা হউক এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি উপাধি যেমন—"পাত্র," "মহাপাত্র" "মহোধিকারী" "সর্ব্বাধিকারী" "রায়" "মণ্ডল," "মহামণ্ডল," "চিতনভিস্," "মহলনবিশ," "ভাণ্ডারী" "ভাণ্ডার কায়স্থ," "পুরকায়স্থ," "শিকদার," "পাটাদার," "তরফদার" "সরকার," "চৌধুরী," "মল্লিক," "বিশ্বাস," "ভৌমিক," "হাজারী," "বকসি," "মজুমদার," ইত্যাদি রাজা বা নবাবপ্রদত্ত সম্মানসূচক উপাধিগুলি বিবিধজাতির মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হইয়া পরিশেষে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বহুবিধ জাতির বংশগত উপাধি থাকা সত্ত্বেও অবান্তর উপাধি দ্বারা নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের (রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও বৈদ্যের দীক্ষাগুরু) বংশগত উপাধি থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা সকলেই "ভট্টাচার্য্য" উপাধিতে বিভূষিত। বাংলার বৈদ্যগণ সেন, দেব, গুপ্ত, দত্ত, কর দাশ (১০) ইত্যাদি নানাবিধ বংশগত উপাধির সহিত "গুপ্ত" (১১) শব্দ যোজনা করিয়া দিয়া পরিচয় প্রদান করেন, আবার কেহ কেহ নষ্ট কুষ্টি উদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান সময়ে নামান্তে "শর্ম্মা" শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। পক্ষান্তরে পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের অনেক ব্রাহ্মণ "শর্ম্মা" বর্জ্জিত উপাধি ব্যবহার করিতেছেন! আবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একদম উপাধিশূন্য নামও অনেকে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন॥

ভারতে যেমন মূলবর্ণ চতুষ্টয় হইতে সহস্র সহস্র জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তেমনিই প্রদেশ ও ভাষাগত পার্থক্যনিবন্ধন লক্ষ লক্ষ উপাধিরও সৃষ্টি হইয়াছে। সেগুলির সম্যক্ আলোচনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলেখকের পক্ষে অসম্ভব। আশা করি আমার ন্যায় সমানধর্ম্মা যদি কেহ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে এতদ্‌বিষয়ে হয়তো তিনি আরও তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন। যাহা হউক আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ এই প্রবন্ধপাঠে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে বর্ত্তমানসময়ে হিন্দুসমাজের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন উপাধিবিশিষ্ট লোক আমরা দেখিতে পাই উহাদিগের অধিকাংশই মূলতঃ অনার্য্য শূদ্র নহেন, পরন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্ভূত।

শ্রীললিতমোহন রায়।

—

(১০) "দাস ও দাশ শব্দে প্রভেদ কি?" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

(১১) বাংলার বৈদ্যদিগের মধ্যে দুই একটি শাখার "গুপ্ত" উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা বলেন যে "গুপ্ত" উপাধি তাহাদিগের বংশগত। অবশ্য উহা বংশগত উপাধি না হইতে পারে এমত নহে, তবে আমরা মনে করি যে উপমা যখন উহাদিগের (অম্বষ্ঠদিগের) বৃত্তি বাণিজ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তখন বৈশ্যোচিত "গুপ্ত" শব্দটি পার্থক্য সংস্থচিত করিবার জন্য উহাদের নামান্তে ব্যবহৃত হইতেছে।

*

যে দুঃসহ সংবাদ লইয়া আজ আমি নব্যভারতে'র পাঠকপাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি, তাহা ব্যক্ত করিতে আমার লেখনী থামিয়া যাইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 'নব্যভারতে'র প্রাণ, কর্ম্মী প্রভাতকুসুম আর ইহজগতে নাই। বিগত ১২ই ভাদ্র রবিবার, বেলা দশটার সময় তিনি দিব্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। সম্বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ৮ দেবীপ্রসন্ন বৈদ্যনাথ ধামে দেহরক্ষা করেন। তখন কেহই ভাবেন নাই যে 'নব্যভারত' বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু যথার্থ যোগ্যপুত্র প্রভাতকুসুম পিতার এ কীর্ত্তি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাগ্রহযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। শুধু যে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন তাহা নহে—তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় নিরপেক্ষতা ও প্রবন্ধের উৎকর্ষতার জন্য 'নব্যভারত' সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। যেমনই, যত বড়ই কাজ হউক না কেন তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার এমন ক্ষমতা বাংলা দেশে সাধারণতঃ কাহারও মধ্যে দেখি নাই। বিধাতাও তাঁহাকে সার্থকতা ও সফলতা দ্বারা মণ্ডিত করিতেছিলেন। স্বকায় বৃত্তিতেও তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেশের কত কাজে হাত দিয়াছিলেন, কি অশান্ত কঠোর পরিশ্রম তিনি করিতেন! কিন্তু তাঁহার মুখে কখনও অবসাদের ছায়া মাত্র লক্ষ্য করি নাই। ট্যাক্সি সমিতির সভাপতিরূপে তিনি কেমন যোগ্যতার সহিত ধর্ম্মঘটকারীও কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আপোষ করাইয়া দিয়াছিলেন! Prisoner's Aid Societyর সম্পাদকরূপে অন্যের উপেক্ষিত দেশের কতবড় একটা কাজ তিনি করিতেছিলেন! তিনি যেমন Labour Problem বুঝিতেন, খুব কম লোকই সেরূপ বুঝিতে পারেন। কত আশা তাঁহার ছিল, দেশের সেবা করিবার জন্য কত উপায়ই তিনি চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু হায়! মঙ্গলময়ের অলঙ্ঘ্য বিধানে তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন তাঁহারাই জানেন তিনি কিরূপ মিষ্টভাষী ছিলেন; তাঁহার হৃদয় কেমন কোমল ছিল, তিনি কিরূপ দেশভক্ত ছিলেন। আজ পঞ্চদশ বৎসর তিনি নীরবে, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কাজ করিতেছিলেন। প্রভাতকোরক প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই ঝরিয়া পড়িল। করুণাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

---

* কেহ যদি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠান আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব। দুই সপ্তাহের মধ্যেই যেন তাহা আমাদের হস্তগত হয়। 'নব্যভারত' রীতিমতই বাহির হইবে।

প্রভাত-স্মৃতি।

[প্রভাতকুসুমের অকালবিয়োগ, নব্যভারতের পৃষ্ঠায় শোকাশ্রুতে অঙ্কিত হইতেছে। পিতার কীর্ত্তিকে স্থায়ী ও উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রভাতকুসুম যাহা করিয়াছেন, নূতন বৎসরের নব্য-ভারত তাহার সাক্ষী। নব্য-ভারতকে উন্নত করিবার জন্য প্রভাতকুসুমের মনে যে আগ্রহ ও সংকল্প ছিল, তাহা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে জীবন্ত আছে। নব্য-ভারত যাঁহার প্রগাঢ় যত্নে পালিত ও অলঙ্কৃত হইতেছিল, তাঁহার স্মৃতিতে এমাসের পত্রের কিয়দংশ উৎসর্গীকৃত হইল।

যাঁহারা প্রভাতকুসুমের অসাধারণ ও অকৃত্রিম সৌজন্যে মুগ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অনেক মর্ম্মস্পর্শী কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সকল লেখা পত্রস্থ করা অল্পপরিসর কাগজের পক্ষে সম্ভবপর নয়। যাঁহাদের করুণ বিলাপ ও সহানুভূতির কথা শোকার্ত্তদের প্রাণে প্রাণে মুদ্রিত রহিল কিন্তু পত্রস্থ হইল না, তাঁহারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবেন না জানি, তবুও কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদের অনুরাগ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছি। শ্রীবিঃ]

স্মৃতি।

বিনামেঘে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়াছে। ৩৬৫ দিনের একটী একটী দিন করিয়া সাড়ে আঠার বৎসর ধরিয়া যাহা জমিয়া উঠিয়াছিল এক নিমেষে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সেই বাল্যজীবনে—এতদিন যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম—একজন সঙ্গী আসিয়া জীবন-তরীকে যে ভিন্ন স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, যাঁহাকে আশ্রয় ও যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সংসার-স্রোতে নানাভাবে ভাসিতেছিলাম, আমার সেই নির্ভর, সেই আশ্রয় আজ ছিন্ন, ভগ্ন হইয়া গিয়াছে আজ আমি সংসার পথে একাকিনী। এক মুহূর্ত্তেই কয় বৎসর স্বপ্নে মিলাইয়া গেল।

কি বলিব। কি ভাবিব। আজ আমার মনের ভিতর সব ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। যেখানে অবিরাম ভালবাসার রস সঞ্চিত হইতেছিল, হঠাৎ তাহার বিরামে মন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অতীত আজ চোখের সামনে স্বপ্নের মতন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ মনে পড়িতেছে, হঠাৎ সংসারের আহ্বানে বাল্য ক্রীড়া ফেলিয়া আসিয়া দেখিলাম, বুকভরা স্নেহ লইয়া, এই সংসার পথের দরজায়, এক সঙ্গী হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শ্বশুরমহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি তোমার ঐ ফুল্লনয়নে এমন কি অঞ্জন লেপন করিয়াছ, যাহাতে পৃথিবীর আর সকল সৌন্দর্য্য তোমার নিকট মলিন হইয়াছে, কেবল বালারুণের নিষ্কলঙ্ক কিরণ রঞ্জিত প্রভাত-কুসুম সকল সৌন্দর্য্যের সার হইয়াছে! তুমি ঐ মুখে কি দেখিয়াছ, আজ ব্যক্ত কর। তুমি কি সকল সৌন্দর্য্যকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছ? ধীর ভাবে বিচার কর, চিরকালের জন্য পৃথিবীর আর সকল শোভা ভুলিতে পারিবে কি না? ঐ ললাটে তোমার অ-দৃষ্ট সুখ দুঃখ লিপি লিখিত আছে তাহা আজ পাঠ কর। এবং বিচার কর, তুমি আমার বাবার সহিত একাত্মক হইবার গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে কি না?"

গুরুতর ব্রত গ্রহণের কথা [illegible] বালিকা-হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। [illegible]তে চম্

[illegible]বাসরে পরিত্র।

তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মাধুর্য্য-মণ্ডিত স্নিগ্ধ সেই দুই নয়ন যেন আমার উপর অমৃত বর্ষণ করিতেছে। সেই স্নিগ্ধ দুই চক্ষে ও বিশাল হৃদয়ে আমার মত অভাগিনীর জন্য কত যে স্নেহ প্রেম সঞ্চিত ছিল, তাহার পরিমাণ তখনও জানি নাই। সকল কথা ভাল বুঝিতেও পারিতাম না। কম্পিত পদে দুরু দুরু বক্ষে অগ্রসর হইয়া দেখি, সে বিশাল হৃদয়ে স্নেহরাশি উছলিত হইয়া উপচিয়া পড়িতেছে। ধরিবার জায়গা নাই।

সংসার তখন কি সুন্দর। পুষ্পাস্তীর্ণ পথে চলিতেও যদি বা ফুলের কাঁটা পায় বিঁধিয়া যায় শ্বশুর শাশুড়ী, সর্ব্বোপরি স্বামী যেন বুক পাতিয়া দিতেন। মানুষ কি এত পায়! না মানুষ এত দেয়?

বিবাহ কি, তখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। তবে ইহা বুঝিলাম, এই সংসারে এমন একজন সঙ্গী পাইয়াছি, তিনি ভালবাসার অপেক্ষাও রাখেন না, পাওয়ার আগেই অফুরন্ত দান করেন।

ইহাতেই একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেলাম। আনন্দে মগ্ন হইয়া ভাবিলাম বিধাতার কি অপার দয়া! বিনা সাধনায় সর্ব্বরকমে অযোগ্যা আমি, আমার ভাগ্যে, আমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, এমন প্রেমে উদ্বেলিত-হৃদয় স্বামী পাইয়াছি। ছেলেমানুষের মতন আত্মহারা-ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতাম।

এখন মনে হইতেছে, অল্প কয়দিনের জন্য বিধাতা অতি বড় সৌভাগ্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। আজ অস্বীকার করিব না, কত বড় মহৎ ও উদার হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াছিলাম মনে করিয়া মনে মনে কতদিন কত গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি। কিন্তু হায়! আজ যে জীবনে এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই যে, সেই মহাপ্রাণ ইচ্ছানত বিকশিত হইবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইয়াছেন! এই সবে আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া, সেই বিকাশের আরম্ভের সূচনা করিতেছিলেন, "সাংসারিক নানা অসুবিধায় এতদিন ইচ্ছা মত চলিতে পারি নাই, এখন কি করিয়া নিজের জীবনকে উন্নত করিতে পারি, পরিবারকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারি ও মানুষকে কত ভালবাসিতে পারি দেখাইব।" কি আকুল আকাঙ্ক্ষা! ভাষার বোধ হয় শক্তি নাই সে আকাঙ্ক্ষার গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে পারে। কত জায়গায় কত লোক ভুল বুঝিয়াছে, তাহাতে দুঃখ করিয়াছেন, কিন্তু ফিরিয়া আঘাত করেন নাই বা বিদ্রোহী হন নাই। আমার মনে মনে একটা আনন্দ জাগিয়া উঠিতেছিল যে, এবার লোকে জানিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে, ঐ প্রাণটা কতখানি বড় ও ঐ অন্তরে কত প্রেমের ভাণ্ডার লুকান রহিয়াছে! কিন্তু বিধাতার এ কি কঠোর বিধান। বিকাশের আয়োজনের আরম্ভেই তাঁহাকে নির্ম্মম হস্তে তুলিয়া লইয়া গেলেন। এ সংসারে আর ফুটিতে দিলেন না। মনে বড়ই সংশয় হইতেছে, সত্যই কি ইহা বিধাতার বিধান।

হৃদয়টি তাঁহার এত কোমল ছিল যে, অনেক সময় কেহ কেহ তাঁহাকে নারীপ্রকৃতি বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। বাস্তবিকই সাধারণতঃ পুরুষের ভিতর এমন কোমল প্রকৃতি খুব কমই দেখা যায়। লোককে ভালবাসিয়া, আদর করিয়া, খাওয়াইয়া, মিষ্টকথা বলিয়া কি তৃপ্তি পাইতেন যাহারা তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছেন সকলেই জানেন। সম্প্রতি সেই ভাব বাড়িয়া চলিয়াছিল।

তাই তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতেছিলেন। বুঝিবা বিধাতা তাহা পূর্ণতর করিবার জন্যই ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

পরিচিত অপরিচিত যাহারই সঙ্গে তাঁহার কথা হইয়াছে কি মধুর সম্বোধন করিতেন! কথা ও কি সুন্দর ভাবে বলিতেন। ভৃত্যদিগকে কি স্নেহের আহ্বানে ডাকিতেন! বাবা ভিন্ন সম্বোধন করিতেন না। বাজারে গিয়াছেন—বাজারে যাওয়ায় তাঁহার একটা আনন্দ ছিল—দাদা বাবু তাদের সকলের। ভৃত্যেরা বাড়ী আসিয়া বলিয়াছে, তিনি বাজারে গেলে কে তাহাকে কোন জিনিস দিবে ব্যস্ত হইয়াছে। দুঃখী গরীব লোকের জন্য মনে একটা খুব সরস সস্নেহ ভাব ছিল। বলিতেন "ওদের কাছে যেমন প্রাণ পাওয়া যায় আমরা সেইরূপ প্রাণের পরিচয় দিতে পারি না।" একবার আমরা ষ্টীমারে সুন্দরবন দিয়া ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যাই। তখন সেই ষ্টীমারের খালাসীদের নিয়া কি যে করিতেন। প্রায়ই ওদের বালতি ভরা ভরা মাছ কিনিয়া দিতেন। একদিন এক ষ্টীমার-ষ্টেশনে একজন লোক দুইটা খুব বড় বড় চিতল মাছ আনিয়াছিল। দুইটি মাছে আধমণের উপর হইল। দুইটি মাছই কিনিলেন, বলিলেন "বেচারীরা সর্ব্বদাই ছোট ছোট মাছ খায়, বড় মাছ কিনিয়া খাইতে পায় না, আমরা খানিকটা নিয়া বাকী মাছটা ওদের দিয়া দিই, কি বল?" বলিয়া খালাসীদের মাছ দুইটা দিলেন ও খাওয়ার পরে—"কি হে কেমন মাছ খাইলে?" বলিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন। কলিকাতা পৌঁছিবার আগের দিন একটা ভেড়া কিনিয়া তাদের দিয়া বলিলেন "তোমরা সকলে মিলিয়া খাইও।" যখন আমরা চলিয়া আসি খালাসীদের কি দুঃখ। তার পরে কতদিন যখনই সেই ষ্টিমারটী কলিকাতায় আসিত সেই খালাসীরা তাঁহাকে দেখিতে আসিত।

এবার বাড়ীর সামনের রোয়াক ভাঙ্গিয়া সমান করিয়া নিয়াছিলেন। আশা ছিল,—বলিতেন—"এখানে আমার (taxi driver) মটরচালকদের সভা (meeting) করিব millhandsদের সভা করিব। তাদের ও কাছাকাছি চারিধারের লোকদের ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাইব।" কত কি করিব, কত আশা আকাঙ্ক্ষা। কত সময় বলিতেন—"জান, আমার বয়স বেশী হইলে practice ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার কাছাকাছি কোন জায়গায় থাকিব! সেখানে আমাদের বাড়ী—যত গরীব দুঃখীর মা-বাপের বাড়ী হইবে। কত লোক আছে, যাদের দেখবার কেউ নাই, আমরা তাদের ঔষধ দিব, মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইব। তাদের দুঃখ কষ্ট যতদূর পারি দূর করিব। তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, একটু আধটু লেখাপড়া শিখাইতে, culture দিতে চেষ্টা করিব। কি বল?" এইরূপ কত কল্পনায় জল্পনায়, কত রাত্ত যে, তাঁর ভোর হইয়াছে। আজ যে কত গরীব দুঃখী জেলে দোকানী পসারী পানওয়ালা—কত নাম করিব তাঁর জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। মিস্ত্রীরা আসিয়া কাঁদিতেছিল আর বলিতেছিল 'কাজ অনেক করিয়াছি এমন মনিব দেখি নাই।' ঐ সহানুভূতি হইতে কয়েদী সাহায্য সমিতির (Prisoner's aid society) কাজ নিয়াছিলেন। সেটা যে তাঁর কত বড় প্রিয় কাজ ছিল। জেল পরিদর্শক (Jail visitor) হওয়ার পর বলিয়াছেন, "হয়তো এ কাজে পরে মেয়েদেরও দরকার হইতে পারে। যদি হয় তোমাকে কিন্তু আমার সঙ্গে, নিব।"

কাহারও জন্ত কিছু করিতে পারিলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেন। তাহাতে তাঁহার বড় ছোট জ্ঞান ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়াছেন, আর কথা নাই, সেখানে গিয়া হাজির। অর্থ, সামর্থ্য কোনটীরই কোন দিন কৃপণতা করেন নাই। কাহারও বাড়ী বিয়ে বা কোন উৎসব, সাজান হইবে খাওয়ান হইবে একবার তাঁহাকে বলিলেই হইল। আর কাহারও ভাবিবার দরকার নাই। যে কোন কাজ হাতে নিয়াছেন কি শৃঙ্খলা ও নিপুণতার সহিত করিতেন। বড় বড় বিষয়ের (organisation) সুব্যবস্থা হইতে রান্নাঘরের রান্না কোনটাতেই নিপুণতার এতটুকু অভাব ছিল না। লোক জন বাড়ীতে খাইবেন নিজে কি আগ্রহ করিয়া রান্না করিতে যাইতেন। রান্না করিয়া আদর করিয়া খাওয়াইতে কি ভালই না বাসিতেন। যেমন প্রেমপ্রবণতা তেমনি কর্ম্মপ্রিয়তা। কাজ ছাড়া থাকিতেই পারিতেন না। আর কি খাটিতেই না পারিতেন। ধনের প্রতি তাঁহার কোন দিনই আসক্তি দেখি নাই। বলিতেন "আমি টাকা পয়সাকে "খোলাম কুচির" মতন জ্ঞান করি।" বাস্তবিক করিতেনও তাহাই। তাঁহার গোপন দান কতছিল। কত ছেলেকে পড়ান, কলেজের বেতন দেওয়া, বই দেওয়া, কত করিতেন। কেহ অভাবে পড়িয়া চাহিলে কখনই ফিরাইয়া দেন নাই। কত সময় কত দান করিয়াছেন আমিও জানি নাই। পরে তাদের বা অন্যের নিকট শুনিয়াছি। দান করিয়া বলিতে ভাল বাসিতেন না।

স্বদেশীর যুগে জাতীয় বয়ন বিদ্যালয়ে ও ১৯০৬ সালে যখন শিল্পপ্রদর্শনী হয় তখন ও গত দুইবার Congress Pandalএ কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিয়াছেন। গতবৎসরের Congress Pandal তিনি না হইলে এত অল্প সময়ে হইয়া উঠিত হইত কি না সন্দেহ একথা অনেকে বলিয়াছেন। ২০ দিন কি অসম্ভব খাটুনীই না খাটিয়াছিলেন। সেখানে কতদিন সেখানকার কনট্রাক্টারদের সঙ্গে তাঁহাদের রুটি তরকারী খাইয়া রহিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে কাজ করিয়া তাদের ও নিজের লোকের মতন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কয় রাত তো একেবারে ঘুমান নাই। যে কাজ লইতেন, তাহাতে একেবারে ডুবিয়া যাইতেন। বলিতেন "যে কোনরূপ কাজ হউক, ভাল করিয়া, সুন্দর করিয়া না করিলে আমি যেন তৃপ্তি পাই না।" চিঠিপত্র বা মোকদ্দমার কাগজ (Brief) যে লিখিতেন, রাশি রাশি কাগজ লিখিয়া গিয়াছেন কোথাও একটু অপরিষ্কার বা কালিপড়া বা যা তা করিয়া লেখা একটুও নাই। মনে হয় যেন সমানে সব জায়গায় ধরিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে লিখিয়াছেন। কলাবিদ্যার (Fine arts) উপর খুব অনুরাগ ছিল। ছবি আঁকা ফটো তোলা খুব সুন্দর পারিতেন। নানা কাজে আজকাল ছবি আঁকিতে ও ফটো তুলিতে প্রায় সময় পাইতেন না, কিন্তু উহার চর্চ্চা করিতে খুব ভালবাসিতেন। আজ ২০ বৎসর Photographic Societyর সভ্য আছেন। যখনই সময় পাইয়াছেন ওখানকার (Competition) প্রতিযোগিতায় ছবি দিয়াছেন। দুইতিনবার পুরস্কারও পাইয়াছেন। কোথায় কোন লাইন, কোথায় কোন shade, কত ক্ষুদ্র জিনিসে ও যে সৌন্দর্য্য দেখিতেন তাহার সীমা নাই। Engineeringএর দিকেও বেশ অনুরাগের পরিচয় দিতেন। বাড়ীটাতে কত জায়গায় বদলাইয়াছেন সমস্তই নিজে একা করিয়াছেন। কাহারও সাহায্য লেন

নাই। Albert Hallএর একটি Plan করিয়াছিলেন সেটী সম্পূর্ণ নিজের মস্তিষ্ক-প্রসূত। ডাক্তারীর উপর তো একটি প্রবল আসক্তি ছিল। রোগীর সেবার হাতটিও বড় কোমল ও আরামদায়ক ছিল। কত ডাক্তারী বই যে কিনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন। Medical Collegeএর উপরের classএর ছেলেদের পাইলেই ডাক্তারীর আলোচনায় বসিয়া যাইতেন। আমি কত সময় বলিয়াছি—'তোমার ব্যারিষ্টার না হইয়া ডাক্তার হওয়াই ছিল ভাল।' বলিতেন—"আগে বুঝিতে পারি নাই, নতুবা ডাক্তার হইলে বোধ হয় ভালই হইত। কত ইচ্ছা করে এ শাস্ত্রের কিছু কিছু সহজ করিয়া লিখিয়া সাধারণের জন্য ছাপাই। এবার নব্যভারতে এটা করিব।" এই সমস্তই তাঁহার জ্ঞানানুরাগের পরিচায়ক। তাঁহার লাইব্রেরীটি যেমন জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের তেমনি কর্ম্মনিপুণতার ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার বিশেষ নিদর্শন। উহা তাঁহার সমব্যবসায়ী সকলেরই গৌরবের জিনিস ছিল।

কি সন্তানবৎসল পিতা ছিলেন, সন্তানদের উপর তাঁহার কি অতুলনীয় স্নেহ ছিল তাহা অবর্ণনীয়। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একটী সন্তান বাহিরে গিয়া অসুস্থ হয়। যদিও ভয় পাওয়ার মতন তেমন কিছু হয় নাই তবুও আমি ভীত হইয়া টেলিগ্রাম করি। রাত দশটার সময় সেই টেলিগ্রাম আসে। তখন আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া খাওয়া দাওয়ার পর শুইয়াছেন। টেলীগ্রাম পাইয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার ঠিক করা ও তাঁহার নির্দ্দেশ মত ঔষধপত্রাদি কিনিতে কিনিতে রাত প্রায় শেষ হইয়া যায়। সকালে ডাক্তার নিয়া রওয়ানা হইয়া যান। পীড়া তত মারাত্মক হয় নাই, আমি তাই নিজেকে একটু সঙ্কুচিত বোধ করিয়াছিলাম। শ্বশুর মহাশয় ও আমাকে অনুযোগ দিয়া চিঠি লিখিলেন। তিনি বলিলেন "কেন তুমি সঙ্কুচিত হইতেছ? অসুখ বেশী হয় নাই ভগবানের অশেষ দয়া। বেশী তো হইতে পারিত। কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না। যখনই ভয় পাইবে আবার টেলিগ্রাম করিবে।" এই আসা যাওয়া ডাক্তার খরচে তাঁহার সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কোন দিনও ইহার জন্য এতটুকু দুঃখিত হন নাই। পাছে শ্বশুর মহাশয় জানিলে আমাকে কিছু বলেন সেই জন্য ইহা ঘুণাক্ষরেও কাহাকেও জানিতে দেন নাই। আজ মনে হইতেছে কে আর এমন করিয়া ভাবিবে বা করিবে। এই কয়দিন পূর্ব্বে ছোট ছেলেটীর ডিপথিরিয় হইয়াছিল—সে দিন কোর্টেএ বিশেষ কাজ, না গেলেই না হয়, তবুও যাইতে দেরী হইয়া গেল। গিয়া কাজের বন্দোবস্ত করিয়া এক ঘণ্টার ভিতর ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসিয়া বলিলেন "এই এক ঘণ্টা—পথে আধ ঘণ্টা ও কোর্টে আধঘণ্টা যে কি করিয়া কাটাইয়াছি বলিতে পারি না। আমার যেন সময় আর পথ ফুরাইতে ছিল না।" দুই দিন পর আবার একদিন সে দুপুরে খুব বেশী অস্থির হইয়া পড়ে। আমি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আসিবার জন্য বলিতে খোকাকে অফিসএ পাঠাই। তিনি তখনই চলিয়া আসেন। বিকালবেলা আমাদের এক আত্মীয় আসিয়া আমাকে বলিলেন, "এরূপ করিয়া officeএ খবর পাঠাইবেন না। আমি তখন সেখানে ছিলাম, তিনি যে কি ব্যস্ত হইয়া আসিলেন বলিতে পারি না। এমন করিয়া ব্যস্ত করিতে নাই।" আজ শুধুই মনে হইতেছে, আমি নিজে কোন বিষয় ভাল বুঝিনা বলিয়া সকল বিষয়ে তাঁহাকে কি ব্যস্ত কত বিরক্তই না করিয়াছি! কিন্তু কোনও দিনই বিরক্ত হন

নাই। কিন্তু আজ সেই চিন্তা কোথায় গেল? ছেলেদের একটু কান্না শুনিলে যে অস্থির হইয়া যাইতেন আজ সেই ব্যাকুলতা কোথায় গেল? আজ যে তাঁহার অবুঝ শিশুরা "বাবা কোথায়? বাবা কখন আসিবে?" বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার সঙ্গে না হইলে যে তাদের খাওয়া হইত না আজ এই সব তিনি কি করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে সহিয়া আছেন? আফিস হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়ার সবুর হইত না, একটী পিঠে একটী কোলে নিয়া বসিলেন। কখনও কাঁধে নিয়া বেড়াইতেছেন। একটু ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই। কি আনন্দই না তাহাতে পাইতেন। খোকা বড় হইতেছে এবার matric পাশ করিয়াছে কি যে তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল বাড়ীতে তাকে laboratory করিয়া দিব, তার জন্য কত কি করিব। তারপর তাকে নিয়া তুমি আমি বিলাত যাইব। কত কি কল্পনা। খুকুমা বলিতে যেন অজ্ঞান হইয়া যাইতেন। কতদিন আমি মুগ্ধনেত্রে তাঁহার খুকুর প্রতি আকর্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। অসুখে পড়িয়াও সমানে খোঁজ নিয়াছেন ৯টা বাজিয়া গেল কিনা Babyর পড়া হইয়াছে কিনা, সে স্কুলে গেল কি না? যাওয়ার ঘণ্টা আগেও যে তাকে তার পড়া হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কে আর এখন এমন আকুল আগ্রহে খোঁজ লইবে? তামাসা করিয়া কত সময় বলিয়াছি "খুকু যেন তোমার নেশা"? সর্ব্বদাই বলিতেন"ছোট্কুকে হারাইয়া ওকে পাওয়ার আমি ওর মায়ায় একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এক এক সময় মনে হয়, ও যখন বড় হইবে, শ্বশুরবাড়ী যাইবে, আমি ওকে ছাড়িয়া কি করিয়া থাকিব? ওযে আমার কত বড় গর্ব্বের জিনিস!! ওকে Cambridge এ পাঠাইয়া পড়াইবেন কত কিছু আশা যে করিয়া রাখিয়া ছিলেন। হায়। সে সব আশাই যে এমন করিয়া শূন্যে মিলাইবে কখনও যে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।

তাঁহার অসুখের সময় খুকু তাঁহার জন্য কত যত্ন করিয়া স্কুলের পথে নামিয়া কয়টী আপেল ও নাসপাতি কিনিয়া আনিয়াছিল। সে বেচারী তো জানেনা কি খাইতে পারেন আর না পারেন নিজের মনে যা ভাল মনে হইয়াছিল,আনিয়াছিল। আমি তাকে বলিয়াছিলাম"খুকু তুমি কিজান না বাবা কি ফল খান?" একথাটী বলাতে তিনি খুব দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"বেচারী ছেলেমানুষ কি জানিবে? মাগো তুমি যে অত করিয়া আনিয়াছ তাতেই বাবার খাওয়া হইয়াছে।" বলিয়া তাকে যে কত আদর করিলেন। এখন সব কথাতেই অশ্রুজল বাধা মানিতে চাহেনা, মনে হয় ওই যে ক্ষুদ্র মনের বিকাশ হইবার যে আদরের জায়গাটী খালি হইয়া গেল তাহা কে পূরণ করিবে?

ছোট ছেলেটীর কথা বলিয়া বলিতেন "বড়কুবাবাকে আমি নিজে পড়াই নাই তাই এখন বড় দুঃখ হয়। আমি পড়াইলে সে পড়ায় আরো ভাল হইতে পারিত। স্বস্থবাবার বেলায় আর এভুল করিব না, তাকে আমি নিজে পড়াইব। ছোট মেয়েটীর কথায় বলিতেন, টুনটুনের মন বড়ই কোমল। তাহাকে মানুষ করিতে কিন্তু আমাদের খুব সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। আজ কি সবই তাঁহার চিন্তার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে?

যখন ছেলেরা বড় হইবে সে কি সুখের দিন বলিয়া কত কল্পনা করিতেন! সেই সব কল্পনা আজ কোথায় মিলাইয়া গেল! কত বলিতেন, আমি বুড়ো হইলেও দেখো কখনই বুড়ো হইবনা আমি চিরকাল এমি যুবাই থাকিব। সে কামনা ভগবান এ কি ভাবে পূর্ণ করিলেন!

যেমন নিজের ছেলেদের তেমনি আত্মীয় স্বজনদের ছেলেদের উপর ও কি স্নেহ ছিল! যুবক সম্প্রদায়ের জন্ত ঐকান্তিক গভীর প্রীতি ও স্নেহ ছিল। তিনি সকলের দাদা ছিলেন। শুধু মুখের নয়, সত্যই তিনি নিজেকে তাদের বড় ভাই বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাদের জন্য কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইতেন না। বাড়ী নূতন করিয়া মেরামত করিতেছেন তাহার মধ্যে ছেলেদের একটা ঘর বা ছাদের দরকারটা তাঁর মনে বিশেষ ভাবে জাগরুক ছিল। "তাঁদের যখনই দরকার, আমার গৃহ তাদের জন্য উন্মুক্ত। খবরের কাগজ রাখিব, তারা আসিয়া পড়িবে, আড্ডা দিবে, যাহা ইচ্ছা করিবে যেন নিজের বাড়ীর মতন ভাবিতে পারে। তুমি মধ্যে মধ্যে একটু আধটু চা খাবার ইত্যাদি দিও।" আজ যে কতজন তাঁহাদের অগ্রজ-হারা হইয়া সংসারে নিজেকে আশ্রয়হীন মনে করিতেছেন ও অশ্রুজলে ভাসিতেছেন তাহা কি তাঁহার মনে একটুও বাজিতেছে না?

বন্ধু-প্রীতির কথা আর কি বলিব! হৃদয়টাই অত্যন্ত কোমল ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। যাহাকে পাইতেন হৃদয়ে ধরিতে চাহিতেন। বন্ধুদের তো কথাই নাই! এই অল্পদিন পূর্ব্বেই তাঁহার এক প্রাণ-প্রিয় বন্ধু রুগ্ন শয্যায় শুইয়াছিলেন, অসুস্থ হওয়ার একদিন পূর্ব্বেও তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জন্য তাঁহার যে কত চিন্তা ভাবনা আকুলতা দেখিয়াছি। বাল্যকালের বন্ধুদের কথা, সেই সময়ের কত স্মৃতির কথা বলিতে বলিতে তাঁর বুক ভরিয়া উঠিত। কেহ একটু ভালবাসা বা সহানুভূতি জানাইলে একেবারে গলিয়া যাইতেন, তাঁহার জন্য তাঁহার কোন কাজ অসাধ্য ছিল না। পিতার বন্ধু হিসাবেও যাহাকে যাহা বলিয়া ডাকিয়াছেন, তাহাদের ঠিক তাহাই বলিয়া ভাবিয়াছেন। নিজের আপনার জন হইতে বেশী ছাড়া কম করিয়া দেখেন নাই। আজ সেই সবই কি এত সহজে তুচ্ছ করিতে পারিলেন! তাঁহাদের যে আজ ডান হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে আজ কেহ পুত্রশোকে কাতর হইয়া কেহ কনিষ্ঠ সহোদর হারাইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন তাহা কি দেখিতেছেন না?

চরিত্রবল তাঁহার যে কতখানি ছিল বাহিরে অনেকে তাহার পরিচয় পাওয়ার বিশেষ সুযোগ পান নাই। জীবনে যে সংযম দেখিয়াছি সাধারণতঃ বেশী লোকের তাহা দেখা যায় না।

সর্ব্বদা সব কাজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিস ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন। প্রথম শ্রেণীর জিনিস ভিন্ন মন উঠিত না, অন্তরও সেইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে পূর্ণ করিতে চাহিতেন। প্রায়ই দেখিয়াছি লোকের সমালোচনা করিতে গিয়া সর্ব্বদা লোকের ভাল দিক দেখিতে চেষ্টা করিতেন।

নব্যভারত যেন তাঁর নেশার মতন হইয়া উঠিয়াছিল! আগামী বৎসর নব্যভারতের চল্লিশবৎসর হইবে তাহাকে নূতন সাজে সাজাইয়া কত রকমে উন্নতি করার ইচ্ছা ছিল। বলিতেন "যদি আমার একটা অযোগ্য ভাই থাকিত, তাহাকে তো খাওয়াইতে পরাইতে যত্ন করিতে হইত। নব্যভারতকে আমি তাহাই ভাবি। ইহাকে মরিতে দিব না। অসুখের ভিতর নব্যভারতের Proof নিয়া কি ব্যস্ত হইয়াছেন! "কতটা ছাপা হইল! ১৫ই বাহির হইবে তো? দেখো যেন আমায় ভুল বুঝাইওনা।" সমানে বলিয়াছেন। স্থির করিয়া বসিতে পারি না তবুও তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া এক একবার Proof

নিয়া বসিয়াছি। আজ তো আর সেই তাড়াও পাইতেছি না, সেই আগ্রহের অনুরোধ শুনিতেছি না।

নব্যভারতের প্রবন্ধ বাছাই (Selection) করিবার সময় যদি আমি সামনে বসিয়া রহিয়াছি পড়িয়া পড়িয়া শোনাইয়াছেন। দুজনে দুজনকে সাহায্য করিতেছি এই আনন্দে শিশুর মতন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। যদিবা গৃহকার্য্যে বা অন্য কোন কাজে উঠিয়া যাইতে চাহিয়াছি কি দুঃখিত হইয়াছেন বলিবার নয়।

সঙ্গণিকা নব্যভারতে থাকা উচিত আমি বলিলাম। তিনি বলিলেন "বাবার মতন কি আর আমার লেখা হইবে? বাবার গৌরব বাবারই থাক্, আমার ওতে হাত দিয়া কাজ নাই।" আমি বলিলাম "নাই বা ভাল হইল, তুমি লেখ ত, ভাল না হয় না দিলেই হইবে।" তারপর তো লিখিলেন। ভালই হইয়াছিল। ভাল বলাতে সে কি তৃপ্তি, আজও আমার মনে হইয়া চোখে জল আসিতেছে। যখন ছাপা হইয়া আসিল বার বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বার বারই বলিতে লাগিলেন, "তুমি সত্যিই বলিতেছ, বেশ হইয়াছে?" আমি তাঁহার উচ্ছ্বসিত আনন্দ দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলাম। এমন ছেলে মানুষী দেখিয়া যেন আমার স্নেহ উথলিয়া উঠিল, চোখে মুখে বোধ হয় কিছু প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি আনন্দে গদগদ হইয়া বলিলেন—"দেখ নালনি, আমার বড় দুঃখ হয় তোমরা তোমাদের নিজেকে জান না। তোমরা যে পুরুষকে কি শক্তি দিতে পার, ঐ একটু কথায়, ঐ একটু দৃষ্টিতে তা যদি তোমরা জানিতে, তবে আমরা যে কত বড় হইতে পারি, তাহা বলিবার নয়।" আজ মনে হইতেছে একটু সামান্য কথায় বা দৃষ্টির পরিবর্ত্তে যে কতখানি হৃদয় পাইতাম তাই কি গর্ব্ব হইয়াছিল? তাই কি তাহা চিরদিনের মতন কোথায় হারাইয়া ফেলিলাম।

বাড়ীর ছোট খাট কাজ করিতেও কি আনন্দ পাইতেন! সময়ে কুলাইত না তাই রবিবারটাতে বাড়ার কত কাজ করিব বলিয়া রাখিয়া দিতেন। সমস্ত কাজই কি নিপুণতার সঙ্গে করিতেন। এবং সেইজন্যই সব কাজই নিজ হাতে করিতে ভালবাসিতেন! অন্য কাহাকেও দিয়া বিশ্বাস বা নির্ভর ছিল না! ঘরে ছবি টাঙ্গাইবেন তাও নিজে কিন্তু সামনে আমাকে থাকিতে হইবে। খুঁটি নাটি কাজ করিবেন আমি সামনে থাকিব ইহাতে কি তৃপ্তি পাইতেন বলিবার নয়। যদি একটু সেখান হইতে নড়িয়াছি অভিমানে ভরিয়া উঠিতেন। আজ তাই ভাবিয়া পাই না সেই এত অল্পে অভিমানী লোক কি করিয়া এমন দূরে যাইতে পারিলেন। ইহা তো তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না! প্রায়ই বলিতেন "আমি তোমায় যেমন ভালবাসি তোমার নামে তোমার কথা মনে হইলে যেমন পাগল হইয়া উঠি আমার জানিতে ইচ্ছা হয় সকলের কি এমন হয়! আমার মনে হয় আমার বয়সে হিসাবে উচ্ছ্বাস বোধ হয় বেশী। আমার ও অনেক সময় তাহা মনে হইত। উচ্ছ্বাসের মাত্রা সময় সময় এত বেশী হইয়া পড়িত যে আমি বাধা দিতে বাধ্য হইতাম। একটু বাধা দিলে সেই মুখখানি, সেই আনন্দে উজ্জ্বল চোখ দুটী কি বিষণ্ণ কি ম্লান হইয়া পড়িত। আজ তাহা মনে পড়িয়া তীক্ষ্ণ শেলের মতন বুকে বিদ্ধ হইতেছে। না বুঝিয়া কত আদরের সমাদর করি নাই, এমন কি অনাদর করিয়াছি। তাহা যে এইখানেই শেষ হইবে তাহা তো স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই!

ব্যস্ত হইয়া আমাদের এখান হইতে পাঠাইয়া দিলেন ও বাড়ী মেরামতে লাগিলেন। কি কি করছ যদি জানতে চেয়েছি—লিখেছেন "এসো, দেখবে একেবারে (surprise) আশ্চর্য্য করে দেবো।" আসিয়া বলিলাম "এ—করেছ কি? এক বৎসরও হ'ল না এতটা না—ই করিতে?" বলিলেন—"বলোনা, বলোনা তুমি ও কথা বলোনা। আর যে যা বলে বলুক, আমি কার জন্যে করিয়াছি? কেন করিয়াছি? তোমারই জন্য অনেক আশা বুকে করিয়া করিয়াছি। তোমার জন্য এতদিন কিছুই করিতে পারি নাই—মনে বড় দুঃখ ছিল। এবার তোমায় দেখাইব যে ভোগ করিতেও জানা চাই। যে ভোগ করিতে জানে না, তার ত্যাগে মহত্ত্ব নাই। তার ত্যাগ ত্যাগই নয়। আমার বড় ইচ্ছা ছিল সব কাজ শেষ করিয়া, ঘর মনের মতন করিয়া সাজাইয়া আমার হৃদয়ের রাণীকে আনিয়া অভ্যর্থনা করব। কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই তোমরা আসিয়া পড়লে। প্রায়ই বলিতেন এখন হইতে প্রায়ই দশ জন করিয়া বন্ধুদের ডাকিব তুমি তাহাদের আদর যত্ন (entertain) করবে। আমি কিন্তু আমার ঘরে কাজেই থাকিব, মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইব, আর ভাবিব, "ঐ যে তুমি সকলকে ভালবাসিতেছ, আদর করিতেছ, সেই স্নেহের উৎস কোথায়? তাহার মূল আমাতে। উহা কেবল আমার, কেবল আমার একার, উহার সবখানি শুধু আমারই, উহাতে তোমার নিজের বলিয়া কিছুই নাই।" কতদিন এই একই কথা বার বার কত বারই যে বলিয়াছেন। এমন আবেগে উচ্ছ্বাসে বলিতে থাকিতেন, আমি বিভোর হইয়া ডুবিয়া যাইতাম। কতবার বলিয়াছেন, "স্বর্গ কি আর অন্য কোথাও—না এইখানেই। আমি ইহাপেক্ষা আর কোন স্বর্গ কামনা করি না।" এত সুখ বুঝি সয় না তাই পেয়ালা যখন কানায় কানায় ভরপুর তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল?

আমার সংসারের গতি কেমন একটু ভাসা ভাসা ধরণের। মগ্ন হইয়া সেইরূপ সুগৃহিণীর মতন কিছু করিতে পারি না। তাই তাহার বড়ই ইচ্ছা ছিল—আমারও মনের প্রাণের কামনা ছিল—এবার তিনি দেখাইয়া দিবেন, আমি বেশ ভাল করিয়া সংসার করিব। তাহারও আমাকে ছাত্রীরূপে কিছু শিখাইতে বড়ই আনন্দ হইত! তাই এবার সব দিকেই দুজনে মিলিয়া জীবনপথে অতি মধুর ভাবে চলিবার নিবিড় আয়োজন চলিতেছিল।

কিছুদিন যাবৎ তাহার সবদিকেই উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যেন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ধর্ম্মের দিকেও বেশ একটা প্রবল আকর্ষণ দেখা যাইতেছিল। উপাসনা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। "বলিতেন ছোটবেলা হইতে ব্রাহ্মসমাজের কোলে মানুষ হইয়াছি ইহার যদি ঝাঁট দেওয়া কাজও হয় তাও করিতে ভাল লাগে।" Congregationএর সহ-সম্পাদক হইয়া অর্থ দিয়া শক্তি দিয়া ইহার সেবা করিয়াছেন। অথচ অন্যধর্ম্মের প্রতি উদারতা খুব বেশী ছিল। যাহাতে হিন্দুসমাজের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতে কোনরূপ আঘাত না পান বা গান গাহিতে তাঁহাদের কোথাও বাধা না লাগে সর্ব্বদা সেই বিষয়ে ভাবিতেন ও বলিতেন। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বইখানি আজকাল প্রায়ই পড়িতেন। ইহার মধ্যে অসুখ যে দিন একটু কম মনে হইয়াছিল সেই দিন বার বার বলিয়াছেন "ব্রাহ্মধর্ম্ম আর চশমাটী

দাও।" এবার ঠিক করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "বাড়ীটা ঠিক করিয়া গুছাইয়া বসিয়া নিতে পারিলেই—রোজ সকালে সকলকে নিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে কিছু কিছু পড়িব। জীবনটা খুব সুনিয়ন্ত্রিত (methodical) করিয়া চলিব আর আমরা "দুটি প্রাণীতে মিলিয়া সব কাজ করিব। এতদিন সংসারের অন্যকর্ত্তব্যে তোমাকে আমি যত চাহিয়াছি পাই নাই, তাই আমার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এবার তুমি আমায় সবটা দিয়ে দাও।" পূর্ব্বে আমাকে শ্বশুর মহাশয়ের আহ্বানে ও অনেক সময় নানা কাজে যাইতে ও ব্যস্ত থাকিতে হইত, তাই তাঁহার আমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেন মিটিত না; এখন সে সাধ পূর্ণ করিবার জন্য কি যে করিতেন। এবার আমি বাড়াতে ফিরিয়া আসা পর রোজ বলিতেন—"তুমি এবার তোমাকে আমার ভিতর ডুবাইয়া দাও। একেবারে সবটা ডুবাইয়া দাও। নিজের বলিয়া কিছু রাখিও না। দেখিবে তুমি আমি কি সুখে দিন কাটাইব। আবার আমরা নববিবাহিতের মতন জীবন কাটাইব। সেই ত আমার আদর্শ। মানুষ কখনও কি এ জীবনকে পুরাণো মনে করিতে পারে? আমার মনে হয়, যত দিন যাইতেছে আমি পাগল হইয়া উঠিতেছি, নূতনত্ব বিচিত্রতা আমার বাড়িয়া যাইতেছে। আমার সম্মুখে কি সুখ কি আনন্দ, ভাবিতেও আমি শিহরিয়া উঠি। জীবন যদি এমন না হইল, তবে আর জীবন কিসের?" সকলই কি শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া এমন করিয়া দিবার ও পাইবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল?

যখনই কোন মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছেন, বলিয়াছেন "বল ত আমরা কে আগে যাইব? আমি আগে যাইব না। বাবা জ্যেঠামহাশয় সকলেই দীর্ঘায়ু। আমিও অনেকদিন বাঁচিব। আমি কখনও তোমাকে এখানে ফেলে আগে যাইতে চাহি না। লোকে শুনিলে কি বলিবে জানি না, হয়ত স্বার্থপর বলিবে, কিন্তু আমি ছেলেদের নিয়া বেশ থাকিতে পারিব। এই সংসার বড় নিষ্ঠুর, এখানে তোমায় একা ফেলে যাইতে পারিব না।" একদিন নয় কতদিন যে একথা বলিয়াছেন। আমিও তাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু যাওয়ার সময় সে প্রতিশ্রুতি, সে মনের প্রাণের কামনা সব কোথায় ভাসিয়া গেল। একটিবারও কি তাহা মনে আসিল না?

গত কয়েক বৎসর হইতে আমাকে ডাকিতে যাইয়া প্রায়ই mother শব্দ ব্যবহার করিতেন। বলিতেন, "তুমি যখন তোমার ছেলেদের সঙ্গে আমায়ও খেতে দাও, আমার তখন মনে হয় আমাকেও তুমি মাতৃরূপে খেতে দিচ্ছ। স্বামী যখন বয়স্থ হয়, আমার মনে হয়, স্ত্রীর কাছথেকে মাতৃস্নেহ চায়। আর মাতৃত্বে পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়াই নারীজীবনের আদর্শ। তোমাতে আমি তাহাই চাই, আর তুমি আমার সন্তানদের মা—তাই আমি তোমায় mother বলিয়া ডাকি। তাঁহার এই ডাকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার এক স্নেহময় কাকাবাবু ও (প্রচারক) আমায় dear mother বলিয়া ডাকেন। আজ কয়দিন ধরিয়া আমার উৎকর্ণ কান থাকিয়া থাকিয়া সেই আকুল আগ্রহ আবেগভরা mother, নলিনি, আরো কত যে আদরের ডাক শুনিবার জন্য যেখানে সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইতেছে! হায়! কোথায়! প্রাণ যে অধীর হইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে, চিরদিনের মতন সেই সুমিষ্ট বাণী কি নীরব হইয়া গিয়াছে?

একসঙ্গে খাইতে ও খাওয়াইয়া দিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রবিবার দিন তো ছেলেদের ও আমাকে এক সঙ্গে বসিতেই হইত। তিনি সকলকে খাওয়াইয়া দিবেন। রবিবার দিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিলে প্রায়ই যাইতে চাহিতেন না। বলিতেন, সপ্তাহের মধ্যে একদিন সকলে একসঙ্গে খাই, এইটাতেই আমি বেশী সুখ পাই। রবিবার দিন নিমন্ত্রণ নিওনা। তাঁহার এক স্নেহময়ী খুড়ীমাকে বলিতেন, "খুড়ীমা, আমি যে নলিনীকে এত আদর করি এ কি অন্যায় করি?"

কত কথা—কথা যে ফুরাইতে চাহেনা, কত আর লিখিব? অসুখের ভিতরও অন্যের ভাবনা। আমি তাঁহার এক বন্ধু ডাক্তারকে ডাকিতে চাহিয়াছিলাম। বলিলেন "তুমি কেন লোককে কষ্ট দিতে চাও? বৃথা ওকে কষ্ট দিও না। প্রথমে তাঁহার অসুখ ডেঙ্গু মনে হইয়াছিল, শেষ কালে যখন বাড়িয়া উঠিল তখন 'I want to live নলিনি I want to live' কতবার বলিয়াছেন। 'চারিটী ছেলে একলা কি করিয়া মানুষ করিবে? খোকা, save your father' এইরূপে কতভাবে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। পরে মুখ ফুটিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'দয়াময়, আমায় সারাইয়া দাও, বাঁচাইয়া দাও।' এত কাকুতি মিনতি এত আকুল আকাঙ্ক্ষা কিছুই কি সেই দয়াময়ের চরণপ্রান্তে পৌছিল না? মনে হয়, মানুষ ত এত নিষ্ঠুর হইতে পারে না তিনি দয়াময় হইয়া কি করিয়া এমন নির্মম হইলেন?

অসুখের প্রথমেই আমার মনে কি এক উৎকণ্ঠা ও আকুলতা আসিয়াছিল বলিতে পারি না। উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে, চিন্তায়, এই কয়দিন সমানে সমস্তরাত মনে প্রাণে আকুল ভাবে একমাত্র বিপদভঞ্জনকেই ডাকিয়াছি। ঔষধ পথ্য দিবার সময় মনে মনে জপিয়াছি "দেখো দয়াময় দেখো, তুমি দয়া করিয়া এই ঔষধে পথ্যে উহাকে আরোগ্যের পথে লইয়া যাইও।" সমস্তরাত কখনও তাঁহার শয্যাপার্শ্বে, কখনও বা সামনের ঘরে অবিরাম অবিশ্রাম বলিয়াছি, "তুমি ত দয়াময়, তুমি ত বিঘ্নহারী দেখো, যেন কোন ভুলক্রটি না হয়। তুমি কর্ণধার হইয়া, পথ দেখাইয়া লইয়া চলিও।" যিনি আসিয়াছেন তাঁহাকেই বলিয়াছি আপনি প্রার্থনা করিবেন। কোথায়! কোথায়! আজ তীব্র আঘাতে ধরাশায়ী হইয়া মনে হইতেছে তিনি মহামহিমাময় রাজরাজেশ্বর, আমাদের আকুল প্রার্থনা কাতর ক্রন্দন বুঝি রাজ রাজেশ্বরের সিংহাসন তলে পৌছিতে পারে না।

যাহার নিকট পৃথিবী এত সুন্দর এত মধুর ছিল, যাহার বাঁচিবার এত সাধ ছিল, যাহার এ পৃথিবীতে কাজ করিবার জন্য উৎসাহ উদ্যমের অবধি ছিলনা, তাঁহার নাকি কাজের প্রারম্ভে এইভাবে জীবনের শেষ হয়। ইহাকে তো কিছুতেই শেষ বলিতে প্রাণ চায় না। প্রাণ যে বড়ই আকুল হইয়া উঠিয়াছে। হে পরম রহস্যময় বিশ্বদেবতা। একমুহূর্ত্তে একি করিলে? এক নিমেষে তুমি রাজাকে পথের ভিখারী কর, তাই যে করিলে! সংসারের সমস্ত আলো যে এক মুহূর্ত্তে আমার চোখে নিবিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সকলই পূর্ব্ব নিয়মে চলিতেছে, শুধু আমারই চোখে তাহার আলো নাই। একেবারে তাঁহাতে ডুবিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, এই কি তাহার পথ করিয়া দিলে? এ কি রকম পথ? এ বন্ধুর পথে যে কি করিয়া চলিব জানিনা, প্রাণ যে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িতেছে, হৃদয় যে রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছে। তোমার কি ইচ্ছা তুমিই জান,

আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিনা। অসহনীয় দাহনে যে জ্বলিয়া মরিতেছি, মনে হয় আমার সব কর্ত্তব্য বুঝি উপযুক্ত রূপ করিতে পারি নাই, তাই বুঝি এ শাস্তি দিয়াছ। অসহায় শিশুদের মুখের দিকে যে তাকাইতে পারিনা। তাহারা যে কিছুই বোঝে না, তুমি যদি ঐ কুসুম কোমল হৃদয়ে এই নিঠুর কঠোর আঘাত দিয়া থাক, তবে নাথ তাদের পিতৃহারা প্রাণে পিতা হইয়া অধিষ্ঠিত হও। আর আমার কথা কি বলিব। এমন কঠোর বিধান করিয়াছ কেন করিয়াছ তুমিই জান। এ বুক ফাটা দুঃখের সান্ত্বনা আমি তোমার কাছে চাহিনা। ইহা আমার হৃদয়ে অহর্নিশি জ্বলিতে থাকুক, তাহাকে আমার দগ্ধ তৃষিত হৃদয়ে চিরজীবিত রাখ এই তোমার চরণে ভিক্ষা।

শোকাশ্রু।

১

একি সর্ব্বনাশ, ও মা একি সর্ব্বনাশ।
কার কথা কহি লোকে
মগ্ন আজ মহাশোকে,
আর্ত্তনাদ উঠে কেন অবনী আকাশ।
সহসা কি আসে কাণে,
শত বজ্র বাজে প্রাণে,
কাঙালের মণিরত্ন—হতাশে আশ্বাস,
কি শুনিতে কি শুনিনু—একি সর্ব্বনাশ।

২

সে যে চিরজীবী "খোকা" দেবের কুমার,
বাপ মা'র পুণ্যফলে
সে এসেছে ধরাতলে
কুলের গৌরব বাছা, বঙ্গ-অলঙ্কার।
"নব্য-ভারতে"র তরে
খাটিছে যে শত করে,
সে যে দেশ-সেবা-ব্রতী, বন্ধ অভাগার।
সে যে কৃতী, কীর্ত্তিমান,
মহান, উদার প্রাণ,
কত কর্ম্মে কর্ম্মী সদা, মূর্ত্তি যোগ্যতার।
সে যে গো রাজার মত,
প্রভাব অপ্রতিহত,
প্রবর্ত্তক নিয়ামক সে যে সবাকার,
চিরজীবী "খোকা" বরপুত্র বিধাতার।

তার কথা কহে কেন অমঙ্গল রবে?
এত কাজ অবহেলে,
সকল কর্ত্তব্য ফেলি
সে কি পারে কোথা যেতে—তাহা কেন হবে?
সুধাব না কারো কাছে,
সে আছে ভালই আছে,
শান্তি মুখ চেয়ে আছে, ঘরে পরে সবে,
এ নিঠুর অবিচার সে করেছে কবে?

৪

তার প্রাণে প্রাণময় তাহারি সংসার,
আছে তারি পানে চেয়ে,
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে,
প্রিয় জায়া—সে কথা যে নহে সহিবার!
বিগত আশ্বিন মাসে,
পিতৃ-দেব সে প্রবাসে
সাধিলা সমাধিযোগ যোগী অবতার।
সব সঁপি সুত-করে,
ঘুমাইলা চিরতরে
আজ্ঞাবহ পুত্র নিল পিতৃকার্য্য-ভার,
সব কাজ অসমাপ্ত, এখনো যে তার!

৫

কোন ব্যাধি পশিল সে সোণার শরীরে,
কোন কাল রাহু হায়,
গ্রাসিল সে চন্দ্রমায়,
সে রবি ঢাকিল কোন জলদ তিমিরে ?
কে নিঠুর কে পাষাণ,
কেড়ে নিল কচি প্রাণ—
আমরা যে কোটিপ্রাণ দিব বুক চিরে,
অভাগা আমরা নাই, সে আসুক ফিরে।

৬

এখনো যে ফোটেনি সে প্রভাত-কুসুম,
অরুণ আলোক মাখি,
এখনো খোলেনি আঁখি,
সোণার নলিনী তার আঁখিভরা ঘুম।
আদরের ধন ক'টি,
হেসে হ'ত কুটি কুটি
সরল বালক আজি নীরব নিস্পন্দ।
শত মুখে লোকে ডাকে,
কে লুকি' রেখেছে তাকে,
হেন অসময়ে তার কেন এত ঘুম ?
অন্ধকার রাজ্যখানি,
কোথা রাজা কোথা রাণী,
কোথা সে আনন্দাশ্রমে উৎসবের ধূম —
কোথা তুমি, কোথা তুমি, প্রভাতকুসুম।

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী।

শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

‘আনন্দআশ্রম’ এবং ‘নব্যভারতে’র প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য ৺দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী লোকান্তরিত হইবার সম্বৎসরের মধ্যেই তাঁহার একমাত্র পুত্র অশান্তকর্ম্মা প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী বিগত ১২ই ভাদ্র বেলা দশ ঘটিকার সময়ে অপরিণত বয়সে জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিতেই আনন্দআশ্রমকে অনাথ ও শ্রীহীন করিয়া শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। জানি না কতদিনে আবার তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানেরা ‘মানুষ’ হইয়া পিতা ও পিতামহের আনন্দআশ্রমে আনন্দ-বাজার বসাইবে।

স্বর্গীয় প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী উলপুরের সুবিখ্যাত বসু রায় চৌধুরী বংশে, তাঁহার মাতুলালয়, বরিশালের অন্তর্গত বানরীপাড়ায়, ১২৮৪ সালের ২৭শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য সহোদরগণ এবং সকল আত্মীয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার এক বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা অস্বচ্ছল অবস্থার মধ্যেই স্ত্রীপুত্রকে নিজের কাছে আনিয়াছিলেন। শিশু জীবনে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। পরে যখন তাঁহার পিতা ধন সম্পদের অধিকারী হইলেন, তখনও আনন্দআশ্রমে প্রতিপালিত পাঁচজনের মতই তাঁহার আহার বিহারের বন্দোবস্ত ছিল, পিতা মাতার একমাত্র পুত্র হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে ভোগ বিলাসের অভ্যাস শিক্ষা দেন নাই। কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিশ্বাসী ও সংযমী পিতামাতার শিক্ষাধীনে তিনি প্রথম হইতেই অতিথিবৎসল, কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মী হইয়াছিলেন। প্রভাতকুসুম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। এফ এ পড়িতে পড়িতেই আইন অধ্যাপনার